মুক্তির মন্দির সোপান তলে

দীপক কুমার রায়

□

অরুণা চৌধুরী

ইণ্ডিয়ান বুক মার্ট

১২/১ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট (দ্বিতল)

কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ই আগস্ট ১৯৬০

প্রাপ্তিস্থান ঃ
দি মডার্ণ বুক ডিপো
৪৭, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলকাতা-৭০০ ০২৬

'একাল সেকাল প্রকাশনী' প্রকাশক শ্রীপবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায় ১/১এ, পদ্মপুকুর স্কোয়ার কলকাতা-৭০০০২৩ এবং শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ 'দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স' ৩২ বিডন রো কলকাতা-৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত।

উৎসর্গ ঃ

বিপ্লবী—গণেশ ঘোষ

বিপ্লবী—প্রবোধ কুমার রায়

বিপ্লবী—মনোরঞ্জন হাজরা

প্রেয়াত বিপ্লবী মুকুর সর্বাধিকারী কে

—শ্রদ্ধার্ঘ—

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

আমাদের বই 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে' প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এখানে যে চরিত্র গুলো আলোচিত হয়েছে তাঁদের অনেকে বিপ্লবাত্মক পথে স্বাধীনতার পক্ষপাতি ছিলেন। মাতঙ্গিনী হাজরা যদিও গান্ধীবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন তবু ৪২ এর আন্দোলনে তাঁকে পুলিশের গুলিতে নিরস্ত্র অবস্থায় আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। আর যে সমস্ত বিপ্লবী রয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই ইংরেজের হাতে জীবন দান করে গেছেন। এখানে পরিশিষ্ঠে যাঁদের জীবন সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে আলোচনা করেছি, তাঁদের জন্মমৃত্যুর তারিখ সংগ্রহ করতে পারিনি, তবে দেশের পরাধীনতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামও ভুলবার নয়।

একথা মনে রাখা দরকার, আপোষপন্থীরা বিপ্লবাত্মক পথের চিরকালই নিন্দা করেছেন। কিন্তু আমরা সকলেই জানি জাতীয় মুক্তির কাজে যে বীর পুরুষেরা বৈপ্লবিক কাজ করেছেন দেশের সুবিপুল জন-সংখ্যা অন্তরের উদ্বেলিত শ্রদ্ধা তাঁদের পায়েই বিসর্জন দেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। স্বদেশে বিজেতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানই বিপ্লবীতত্ত্ব। এতত্ত্বে বিজেতার সঙ্গে কোন আনুগত্যের সম্পর্ক নেই। বাঘা যতীন, সূর্য্য সেন, গোপীনাথ সাহা, উল্লাসকর দত্ত, ননীবালা এবং প্রীতিলতাদের বিপ্লবাত্মক সংগ্রাম সর্বত্রই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তারুণ্যের দাবী এতটুকুও কম ছিল না।

আমাদের মনে হয় সহিংস ও অহিংস দু'ধারার মিশ্রণেই ভারতে স্বাধীনতা এসেছে। যারা বৈপ্লবিক আন্দোলনকে ছোট করে দেখেন তারা ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশকে ছোট করে দেখেন। আমাদের এই বইএর বেশিরভাগ বিপ্লবী তরুণেরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যে এক

গৌরবান্বিত ও কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন সে বিষয়টিকে আজকের তরুণদের কাছে এই বইএর মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র।

বলতে দ্বিধা নেই ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে জাতীয় মুক্তির যে বৈপ্লবিক প্রয়াস শুরু হয়েছিল তা ফুলে ফলে পল্লবিত হয়েছিল আমাদের আত্মত্যাগী বিপ্লবী দামাল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে। একথা বলতেই হয় ৪২ এর আন্দোলনে গান্ধীজী যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তাতে তাঁর 'করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে' মন্ত্রের মধ্যে কিছুটা প্রচ্ছন্নভাবে হলেও বৈপ্লবিক চিন্তা কাজ করেছে। এই মন্ত্রকে অবলম্বন করে বহু মানুষ সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বৈপ্লবিক চেতনা নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে তারা সরকারের যুদ্ধোদ্যমকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন, যেমন থানা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন ইচ্ছাকৃতভাবে, ডাক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। উত্তর বিহার ও অন্যান্য স্থান মিলিয়ে নয়শতের মত রেল ষ্টেশন পুড়িয়ে দেওয়া ও ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। শাসনযন্ত্র কিছুকালের জন্য হলেও নিশ্চল করে দেওয়া হয়েছিল। তাই গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও অহিংসার সম্পূর্ণ বিপরীত মার্গের কাজ চলেছিল সেদিন। সেজন্যই বিপ্লবী আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছিল।

আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা যে আদর্শ সামনে রেখে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিল তীব্র জাতীয়তা বোধ। আমাদের ভারতবাসীর জাতীয় দর্শনের মূল কথা হচ্ছে বিশ্ব মানবিকতা। তাই জাতীয়তাবাদ যতই উগ্র হোক না কেন, তাতে আন্তর্জাতিকতা এসে গেছে বারে বারে। সারা বিশ্বে যেদিকে তাকাই না কেন সেখানেই আমরা দেখতে পাই জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্রকে অবলম্বন করে আন্তর্জাতিকতাবাদে উন্নীত হয়েছেন বিপ্লবীরা। বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদ

ছাড়া আন্তর্জাতিকতার স্বপ্ন শূন্যে সৌধ নির্মাণের মত। তাই হোচিমিন, মাও সে তুঙ এর মত বিপ্লবীকে দেখতে পাই তাদের দেশের অতীত দিনের ইতিহাসকে বারে বারে অনুধাবণ করে তার নির্যাসকে ছড়িয়ে দিয়েছেন মানুষের মধ্যে।

আমরা যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রাণপুরুষ রামমোহন ও ডিরোজিওর কথা বলে গর্ববোধ করি তারা শুধু ভারতের নয়, এশিয়ার নয়, তারা সমগ্র বিশ্বের মুক্তিকামনা করেছিলেন। আমাদের বই "মুক্তির মন্দির সোপান তলে" যে সমস্ত নির্যাতিত ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা আলোচনা করেছি, তারা সকলেই দেশের মুক্তির সঙ্গে সুখী সমৃদ্ধ দেশবাসীকে দেখতে চেয়েছিলেন। এ বই এ যাদের জীবন তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি তারা সকলেই আপোষহীন ভাবে সংগ্রাম করে গেছেন, তাই তাঁরা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত আপোষহীন সংগ্রামী।

কেবলমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামেই জাতীর কর্ত্তব্য ফুরিয়ে যায় না, তাই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন আলেখ্য আলোচনা করে আমাদের তরুণ সমাজ তাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশরক্ষার কাজে এগিয়ে আসার সংকল্প গ্রহণ করবে—এই প্রত্যাশা নিয়েই আমরা এজাতীয় একটি বই পাঠককে উপহার দিচ্ছি।

সুদীর্ঘ শ্রমে সুগভীর অধ্যয়নে ও মূল্যায়ণের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের চিত্রণ করেছি। সুধী পাঠক বৃন্দ এই বইটি সমাদরে গ্রহণ করলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

"মুক্তির মন্দির সোপান তলে" গ্রন্থটিতে যে সমস্ত বিপ্লবীরা স্থান পেয়েছেন আমরা তাঁদের বৈপ্লবীক কর্মকাণ্ডের সময় অনুযায়ী না সাজিয়ে তাঁদের বয়স অনুযায়ী সাজিয়েছি। কারণ জন্মের সাল তারিখের

নিরিখে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে যে, একজন দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে আত্মাহুতি দিয়েছেন কৈশোরে বা অপরিণত বয়সে, আবার কেউ বা পরিণত বয়সে। বস্তুত যিনি অপরিণত বয়সে ঘটনাচক্রে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন আবার অন্যজন যিনি পুলিশের গুলিতে পরিণত বয়সে জীবন দিয়েছেন, উভয়ের ক্ষেত্রেই কিন্তু রাজনৈতিক জীবনের বীজ উপ্ত হয়েছে অপরিণত বয়সেই বা কৈশোরে। তাই আমরা সবদিক বিবেচনা করে এ গ্রন্থের চরিত্রেগুলোকে বয়স অনুযায়ী সাজিয়ে পাঠক সাধারণকে পরিবেশন করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তথ্যসূত্র :—পুস্তকটি রচনায় বসুমতি মাসিক পত্রিকা, ভারত কোষ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, সুবল চন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত সরল বাঙ্গালা অভিধান, সুবোধ সেনগুপ্ত সম্পাদিত সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান, Who's Who of Indian Martyers : Ministry of Education, Govt. of India এবং আরোও অনেক পত্রিকা ও পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে "একাল সেকাল প্রকাশনীর" প্রকাশক পবিত্র মুখোপাধ্যায়কে সাধুবাদ জানাই কারণ তিনি এজাতীয় একটি মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দিয়ে বইটি প্রকাশনার দায়ীত্ব নিয়েছেন। "ইণ্ডিয়ান্ বুক মার্ট" এর স্বত্বাধিকারী সমীর সরকার কে ধন্যবাদ জানাই, তিনি একাধারে সুষ্ঠুভাবে প্রুফ রিডিং এবং অন্যদিকে এডিটিং এর কাজ করে বইটি পরিবেশনের দায়ীত্ব নিয়েছেন। এতৎসত্বেও যদি কিছু ত্রুটীবিচ্যুতি থাকে সেজন্য আমরা দুঃখিত।

দীপক কুমার রায় / অরুণা চৌধুরী

বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসু

ভারতের যে স্বাধীনতা এসেছে তা আমাদের অমর বিপ্লবীদের কাম্য ছিল না, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস আমাদের এই খণ্ডিত স্বাধীনতা ভোগ করতে হচ্ছে। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেখা যায় কণামাত্র স্বাধীনতা পেতে গেলে বহুমানুষের আত্মত্যাগ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দুর্ভাগ্য হচ্ছে যারা জীবন উৎসর্গ করে পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আলো প্রজ্জ্বলিত করবার জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন তাদের কথা খুব বেশী ভাববার অবকাশ আমাদের হয় না। তাই আমাদের মনে করিয়ে দিতে হয় বিপ্লবী বীর সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। আজ তাৎক্ষণিক সুযোগ সুবিধার জন্য অনেক সময় অযোগ্য রাজনৈতিক নেতাদের তোষামোদ করি। বিশেষতঃ যাদের কথা আমরা বেশি বলি তারা নিজেদের উন্নতির কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন না এবং ব্যক্তিগত লাভের জন্য যতটা সংকীর্ণ হতে হয় তারা তাই করে থাকেন। যাদের চালিকাশক্তি হয় কিছু তোষামোদকারীর দল।

১৮৮২ সালের ৩০শে জুলাই মেদিনীপুরে সত্যেন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম অভয়চরণ বসু। সত্যেন্দ্রনাথের পৈতৃক নিবাস ছিল ২৪ পরগণার বোড়াল গ্রামে। ইনি রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৮৯৭ সালে মেদিনীপুরের কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স ও মেদিনীপুর কলেজ থেকে ১৮৯৯ সালে এফ এ পাশ করেন। অতঃপর কলকাতা সিটি কলেজে বি. এ পড়বার জন্য ভর্তি হয়েও দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য পরীক্ষা দেওয়া তার হয়ে ওঠেনি।

এরপর দেখা গেল তিনি রাজনৈতিক গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করেন। ১৯০২ সালে মেদিনীপুরে সত্যেন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রনাথ এবং জ্যেঠামহাশয় রাজনারায়ণের প্রভাবে একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠে এবং এর নেতৃত্বে আসেন হেমচন্দ্র দাস কানুনগো এবং সত্যেন্দ্রনাথ তার সহকারী হোন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হলে মেদিনীপুরে এরা ছাত্রভাণ্ডার গড়ে তোলেন। মেদিনীপুরে ১৯০৬ সালে একটি কৃষি শিল্প প্রদর্শনী হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ এই প্রদর্শনীর সহসম্পাদক হয়েছেন। বলাবাহুল্য এখানে তার নির্দ্দেশেই ক্ষুদিরাম "সোনার বাংলা" শীর্ষক বিপ্লবাত্মক ইস্তাহার বিলি করতে গিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন। এদিকে মিথ্যা অছিলায় ক্ষুদিরামকে মুক্ত করার অপরাধে তিনি চাকরী থেকে বরখাস্ত হন।

এরপর তাকে রাজনৈতিক কাজের ব্যাপারে আরো বড় দায়িত্ব নিতে হয়েছে। হেমচন্দ্র ১৯০৬ সালে বোমা প্রস্তুতের কাজ শেখাব জন্য প্যারিস যান তখন তিনি মেদিনীপুর জেলায় তার স্থলে জেলা সংগঠক হন। ১৯০৭ সালে মেদিনীপুর রাজনৈতিক সম্মেলনে বঙ্গ বিভাগ বিরোধী আন্দোলনের নরমপন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালে সম্মেলন ভেস্তে যায়। এভাবে সুরাটের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনও পণ্ড হয়। এ সময় তিনি বাল গঙ্গাধর তিলকের পক্ষে ছিলেন। ১৯০৮ সালে বাংলার প্রথম বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ড কিংসফোর্ড হত্যা প্রচেষ্টার আগেই তিনি বন্দুক রাখার অপরাধে মেদিনীপুর জেলে বিচারাধীন বন্দী ছিলেন। পরে বিখ্যাত আলিপুর বোমা মামলার আসামী করে তাঁকে আলিপুরে নিয়ে আসা হয়। বিচার চলাকালে দলের নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হলে হেমচন্দ্র ও তিনি জেলে বসেই বিশ্বাসঘাতককে নিশ্চিহ্ন

করবার সিদ্ধান্ত নেন। ঘটনাচক্রে দুটি রিভলবারও সংগ্রহ করেন। কানাইলাল দত্তও এ কাজে এঁদের সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসেন। এদিকে সত্যেন্দ্রনাথ কিছুদিন পর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হাসপাতালে ভর্তি হবার পর তিনি রাজসাক্ষী হতে চান এবং পরামর্শের জন্য নরেন গোঁসাইকে চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠান। এ সময় ১৯০৮ সালের ৩০শে আগষ্ট কানাইলাল অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরের দিন ৩১শে আগষ্ট নরেন একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেন্টের প্রহরায় তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যেন্দ্রনাথের রিভলবার থেকে গুলি বেরিয়ে নরেনের উপর পড়ল এবং নরেন গোঁসাই পালাবার সময় কানাইলালের গুলিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। অবশেষে কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসির হুকুম হয়। সত্যেন্দ্রনাথের মাতা কারারক্ষীর সামনে কাঁদবেন না—এই প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি মাতার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হলেন। সত্যেন্দ্রনাথের মৃতদেহ তাঁর আত্মীয়স্বজনের কাছে দেওয়া হয়নি। তবে ভাবতে ভাল লাগে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর মত মানুষ ওঁর মৃত্যুর আগে জেল প্রাঙ্গণে গিয়ে প্রার্থনা করে আসেন। মুক্তির মন্দির সোপানতলে এভাবেই সত্যেন ও কানাই নিজের জীবন দান করে একদিন আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে ইংরেজের হাতে এদেশ বিক্রি করে দিয়েছিল তাদের হ'য়ে প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন।

তবে একথা বলতেই হবে যে, তাঁদের কল্পনার ভারতবর্ষ অনেক দূরে। এরজন্য আমাদের আরো ত্যাগস্বীকার করতে হবে—তবেই হবে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মত বিপ্লবীকে স্মরণ করার সার্থকতা। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসির দিনটি ছিল ১৯০৮ সালের ২১শে নভেম্বর।

স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা

আমাদের দেশের মেয়েরা সুযোগ পেলে কত বড় কাজ সমাধা করবার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে তা মাতঙ্গিনী হাজরার জীবন অনুধাবন করলে ভালভাবে বোঝা যায়। যদিও অহিংস রাজনীতির উপাসক হয়েছিলেন মাতঙ্গিনী, কিন্তু আমরা দেখছি গান্ধীজীর অহিংস পন্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল কারণ গোটা বেয়াল্লিশের আন্দোলন আর অহিংস ছিল না। ইংরেজ যখন প্রচণ্ড বর্বরতার মাধ্যমে মানুষের উপর অত্যাচার শুরু করে, তখন মানুষও পাল্টা আঘাত দিতে শুরু করে এবং অনেকেই পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। মাতঙ্গিনীকে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ না দিতে হলেও পুলিশের গুলিতে তাঁকে শহীদ হতে হয়েছে।

১৮৭০ সালে মাতঙ্গিনী মেদিনীপুর জেলার হোগল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস মাইতি এবং স্বামীর নাম ত্রিলোচন হাজরা। কি পারিবারিক জীবন, কি স্বাধীনতা সংগ্রামের জীবন সকল ক্ষেত্রে মাতঙ্গিনীকে প্রচণ্ড সংগ্রাম করে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছিল। তাঁর পিতা অল্প বয়সে মাতঙ্গিনীর বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস ১৮ বছর বয়সে বিধবা হয়ে মাতঙ্গিনী পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। ১৯৩২ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা পতাকা উত্তোলনের পর শোভাযাত্রা শুরু করেন। সেখানেও মাতঙ্গিনী তাদের সঙ্গী হতে দ্বিধা করেননি। এ বছরেই আলিনাম লবণ কেন্দ্রে লবণ প্রস্তুত করে আইন অমান্য করেন। এ যাত্রায় পুলিশ তাঁকে

বহুদূর পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেন। এর কিছুদিন পর চৌকি-দারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে যোগ দিয়ে শোভাযাত্রা বার করেন এবং 'গভর্ণর ফিরে যাও' ধ্বনি দেওয়ায় ছয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বহরম-পুর জেলে বন্দী থাকেন। ১৯৩৩ সালে মহকুমা কংগ্রেস কমিটি অবৈধ থাকাকালীন তমলুকে মহকুমা কংগ্রেস সম্মেলনে ও ১৯৩৯ সালে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস মহিলা সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। তাঁর সেবাপরায়ণতা মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা উপলব্ধি করেছেন। তিনি আশেপাশের গ্রামে কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগ হলে সেবা করতে যেতেন। এজন্য তাঁকে স্থানীয় লোকেরা গান্ধীবুড়ি নাম দিয়েছিল। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে তিনি এক বিরাট সেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে থানা দখল করতে যান। ঐ সময় ইংরেজ সৈন্যদল গুলি চালাতে শুরু করলে সেচ্ছাসেবক বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এই দৃশ্য দেখে জাতীয় পতাকা হাতে মিছিল নিয়ে তিনি অকম্পিত পদে অগ্রসর হলেন। এই সময় পুলিশ প্রথমে তাঁর দুই হাতে এবং শেষে তাঁর কপালে গুলি করে। আমরা দেখলাম জাতীয় পতাকা উচ্চে রেখে পুলিশের গুলিতে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

এভাবে মেদিনীপুরের গান্ধীবুড়ির মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হল। তবু তার হাতে জাতীয় পতাকা শোভা পাচ্ছিল।

মাতঙ্গিনীর জীবনের ব্রত ছিল তিনি এদেশকে স্বাধীন করবেন। তাই সেদিন সেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে পতাকা হাতে চলেছেন মাতঙ্গিনী। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি জীবনকে সার্থক করলেন।

মাতঙ্গিনী হাজরার ত্যাগ অনেকের কাছে সামান্য ঘটনা হলেও তা

কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। মাতঙ্গিনীর জীবন উৎসর্গের ঘটনা আজকের তরুণ-তরুণীদের জীবনকে নূতনভাবে বাঁচাতে শেখাবে।

ভাবতে অবাক লাগে একজন বৃদ্ধাকে তাঁর আদর্শে অবিচলিত দেখে তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলতে ইংরেজের দালাল পুলিশের একটুও বাঁধেনি। মাতঙ্গিনী হাজরা আমাদের জাতীয় গর্ব।

মাতঙ্গিনীর শহীদ হবার দিনটি ছিল ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ সাল। বৃটিশ সরকার বিবেকবর্জিত উপায় অবলম্বন করে ৪২-এর আন্দোলন দমন করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেদিন মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা পাবার যে দুর্বার আকাঙ্খা এসেছিল, তাকে ইংরেজ পুলিশের পক্ষে থামিয়ে দেবার চেষ্টা অসফল হয়েছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঘা যতীন ও তাঁর সঙ্গীদের আত্মদান

বাঘা যতীন ও তাঁর সঙ্গীগণ সেদিন পরাধীন ভারতে যে সংগ্রামী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তা দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবক্ষয়ের যুগে আলোর দিশারী হিসাবে কাজ করবে বলে বিশ্বাস করি। বাঘা যতীনের আসল নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আমরা তাঁকে বাঘা যতীন বলেই জানি।

১৮৭৯ সালে অবিভক্ত বাংলা দেশের যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার সাধুহাটি বিসখালি গ্রামে (মতান্তরে ১৮৮০ সালের ৮ই ডিসেম্বর কয়াগ্রামে) যতীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাণ্ডিত্য ও চরিত্রগুনে গ্রামে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ শৈশবেই পিতৃহীন হন এবং তাঁর মাতা শরৎশশী দেবী ও দিদি বিনোদ বালা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে কুষ্টিয়ার কয়াগ্রামে মামার বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য চলে আসেন। বাঘা যতীনের জীবনে আধ্যাত্মিকতা ও দেশ প্রেমের যে সমন্বয় হয়েছিল এর প্রেরণা ছিলেন শরৎশশী দেবী।

যতীন্দ্রনাথের বাল্যকাল ও কৈশোর কেটেছিল মামাবাড়ির সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিবেশে। ছেলেবেলায়ই তিনি ব্যায়াম খেলাধূলা, সাঁতার ঘোড়ায় চড়া, সমাজ সেবা, অভিনয় ইত্যাদিতে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন।. যতীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তীকালে কৃষ্ণনগরে ছোটমামা ললিত চ্যাটার্জীর বাড়িতে থেকে এ. ভি. স্কুলে পড়তেন এবং ঐ স্কুলে পড়েই ১৮৯৮

সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর কলকাতায় এসে সেণ্ট্রাল কলেজে ভর্ত্তি হন। এখানে এসে তাঁর তথাকথিত লেখাপড়া খুব বেশী এগোয়নি, কারণ জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রের সন্ধান পান। দেশের ডাক তার অন্তরে নুতন স্পন্দন জাগায়। বাঘা যতীন এরপর ভোলানন্দ-গিরি মহারাজের আশীর্বাদ লাভ করেন। গিরিমহারাজ তাঁকে শুধু আধ্যাত্মিকতাবাদের বীজমন্ত্রদান করেননি, সেই সঙ্গে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের সংগ্রামেও তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন।

বাঘা যতীন আধ্যাত্মিক জীবনচর্চার সঙ্গে শরীর চর্চাকে অঙ্গীভূত করেছিলেন। তিনি দেহে সিংহের বল ও অন্তরে ক্ষাত্রবীর্য লাভ করেছিলেন।

১৯০০ সালে বাঘা যতীন লেখাপড়া ছাড়ার পর ষ্টেনোগ্রাফারের চাকরী নেন। প্রথমে কিছুদিন সওদাগরী অফিসে কাজ করার পর মজঃফরপুরে ব্যারিষ্টার কেনেডির ষ্টেনোগ্রাফার হয়েছিলেন এবং ১৯০৪ সালে সরকারের অর্থনৈতিক বিভাগীয় সেক্রেটারীর ষ্টেনোগ্রাফার হন। এর কিছুদিন আগে একটি ব্যাঘ্রকে হত্যা করার জন্য যে কসরত করেন তাতে তাঁর স্বাস্থ্যহানি হয়। এরপর কিছুদিনের জন্য তিনি দার্জিলিংএ বদলী হন এবং স্বাস্থ্য উদ্ধার করেন।

বাঘা যতীন নামটি কিন্তু তার হয়েছিল ব্যাঘ্র হত্যা করে বহুমানুষের জীবন রক্ষা করার জন্য। একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক যে, তাঁর জীবনধারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট ছিল বলে মনে হয়। এজন্যই দেখা যায় তিনি বিবাহিত হয়েও নির্লিপ্ত জীবন যাপন করতেন এবং সত্যের সন্ধানে সারাটা জীবন কাটিয়েছেন। ভারতবর্ষের পরাধীনতার গ্লানি তাকে এমনভাবে মর্মাহত করেছিল যে তিনি অনুভব করলেন দেশমাতৃ-

কার শৃঙ্খলমোচন সর্বাগ্রে প্রয়োজন, তবে ভারতের আপামর জনসাধারণকে সুখী করা যাবে।

বাঘা যতীনের জীবনে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটল যখন তিনি তাঁর ছোট মামা ললিত চ্যাটার্জীর সঙ্গে ১৯০৩ সালে একদিন শ্যামাপুকুর ষ্ট্রীটে যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের বাড়িতে আসেন। সেখানে অরবিন্দ ঘোষ এবং যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের পরবর্ত্তীকালে নিরলম্ব স্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এদের কাছেই বাঘা যতীনের বিপ্লব কর্মে দীক্ষালাভ ঘটে। এরপূর্বে অবশ্য তাঁর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ হয় এবং সেই সঙ্গে মা সারদা দেবীর আশীর্বাদ লাভে ধন্য হন। যাই হোক বাঘা যতীন বুঝতে পারলেন যে রাজনৈতিক মুক্তিছাড়া দেশের মঙ্গল হতে পারে না।

১৯০৫ সালে যখন স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে বিপিন পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ দেশের যুবকদের ডাক দিলেন তখন বাঘা যতীন আর স্থির থাকতে পারেন নি। তিনি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

অরবিন্দের বক্তব্য ছিল নিরস্ত্র প্রতিরোধের পাশাপাশি সশস্ত্র সংগ্রাম বা বৈপ্লবিক পথ যুক্ত হবে। এব্যাপারে তাঁর গুরু ছিলেন এবং নেতা ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক। তিনি বাংলায় একটি বৈপ্লবিক কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ১৯০১ থেকে ১৯০২ সনে বরোদার গাইকোয়াড়ের সৈন্যবাহিনীর সৈনিক যতীন্দ্র নাথ ব্যানার্জীকে কলকাতায় প্রেরণ করেছিলেন। যতীন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর এবং পরবর্ত্তীকালে অরবিন্দের অনুজ বারীন ঘোষের নেতৃত্বে একটি বৈপ্লবিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবাহ এই যুবগোষ্ঠীকে তৎপর করে তোলে।

১৯০৬ সালে এদের মুখপাত্র যুগান্তর প্রকাশ করলেন আর ১৯০৭ সালে এরা মাণিক তলার বাগান বাড়িতে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড কেন্দ্র স্থাপন করলেন। বাঘা যতীন মাঝে মাঝে মাণিক তলার বাগান বাড়িতে যেতেন। নেতৃবৃন্দ তাকে বাংলার বিভিন্ন জেলায় পাঠাতেন সংগঠন গড়ে তোলার জন্য। একটা কথা আমরা যেন ভুলে না যাই যে, বাঘা যতীন সরকারী কাজে কর্মরত থাকাকালীন দ্রুত গতিতে বিপ্লবী আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন গোপনে গোপনে।

এদিকে ঘটনাচক্রে এই সময়ে অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এক আত্মীয়ের জন্য পাত্রী দেখতে গিয়াছিলেন যে বাড়িতে সেখানেই ব্যাঘ্র হত্যার পর বাঘা যতীন ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। তার-পর থেকে অমরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে বাঘা যতীনের জীবনের দীর্ঘ পথপরিক্রমা ঘটে।

এরপর আলীপুরের বোমা মামলায় যে কুখ্যাত ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ শামস্-উল-আলম অতিশয় উৎসাহ দেখিয়েছিলেন তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারী। ঘটনা স্থল ছিল কলকাতা হাইকোর্ট। বীরেন দত্তগুপ্তকে নিয়ে যতীন একাজটি সম্পন্ন করেন। তবে যতীন পালাতে সক্ষম হন। বীরেন ধরা পড়েন ও তাঁর ফাঁসি হয়। পুলিশ যতীনকে ঘটনার দুদিন পরে হাইকোর্ট থেকে গ্রেপ্তার করে। ইতিমধ্যে ১৯১০ সালে ১২ ফেব্রুয়ারী তাকে হাওড়া, চব্বিশ পরগণা এবং কলকাতার কয়েকটি ডাকাতি সম্পর্কে "হাওড়া গাণ্ড কেস" নামে একটি কেসে অনেকের সঙ্গে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকে শামস-উল-আলম হত্যা মামলায় জড়াবার চেষ্টা হয়। যাই হোক এ যাত্রায় আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে যতীন

ছাড়া পেলেন। কারণ যতীনের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্ট এখন কোন যুক্তি গ্রাহ্য প্রমাণ দাখিল করতে পারেন নি, যাতে তাঁকে তখন জেলে আটক রাখা যায়। এরপর বাঘা যতীন পুর্ণোদ্দমে কাজ শুরু করে দিলেন। ইতিমধ্যে ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রাধান্যটা থেকে যায় বিপ্লবীদের হাতে। এর কারণ এসময় অনেক গুলি প্রতিভাশালী বিপ্লবী জীবন একত্রে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কাজ করে যাচ্ছিল এবং সবসময় তাদের চিন্তাধারার মধ্যে ছিল বড় কিছু করার। এখানে আরেকটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তৎকালীন দুটি বিপ্লবীদল যুগান্তর ও অনুশীলন যেমন নিজ নিজ দলকে শক্তিশালী ও প্রসারিত করছিলেন ঠিক তেমনি ভাবে একদল আরেক দলের সঙ্গে বোঝাপড়া করেও ছিলেন।

বাঘা যতীন, অমরেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ, বিপিন গাঙ্গুলী বাইরে ভুপেন্দ্র নাথ প্রভৃতি যুগান্তরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ১৯৪৪ সালে ঠিক করলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁরা জার্মান সরকারের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সাহায্য নেবেন। অবশ্য এ সিদ্ধান্ত নেবার অনেক আগেই জার্মান কনস্যুলেট জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁরা ব্যাংকক, বাটাভিয়া, ইন্দোচীন প্রভৃতি জায়গায় জার্মান রাষ্ট্রদুতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা অনুশীলন দলের সঙ্গে আলোচনাও করেন। অনুশীলন দল এতে তেমন সায় দিতে পারেনি। অবশ্য তাদের দিক থেকে যুক্তিও ছিল। রাস বিহারী বসু বলেছিলেন, জার্মানীকে বিশ্বাস করা যায় না। ব্যারিষ্টার পি. মিত্র, যোগেশ বসু, শচীন সান্যাল প্রমুখ ব্যক্তিদের মতামত ছিল এই যে, ভারতের সৈন্য বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের বীজ উপ্ত করতে পারলে তাতে

কাজ ভালো হতে পারে। ইতিমধ্যে ১৯১৪ সালের অনেক আগেই জার্মানী কি করবে না করবে সে প্রশ্ন যখন ওঠেনি তখন থেকেই একাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর মধুসূদন ভট্টাচার্য বিপ্লবীদের ওপর ভয়ানকভাবে নজর রাখত। তাকে ১৯১৫ সালের ১৬ই জানুয়ারী কলুটোলার কাছে গুলি করে মারা হল। গভর্ণমেণ্ট যাদের উপর সন্দেহ হয়, তাদের যে বর্ণনা দেয় তা যতীন ও চিত্তপ্রিয়র (চিত্তপ্রিয় চক্রবর্ত্তী) সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। তেমনি আরেকজন গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখার্জীকে চিত্তপ্রিয় হেতুয়ার সামনে মেরে ফেলে। তার আর্দালী শিউপ্রসাদ কাহারও গুলির আঘাতে তিনদিন পর মারা যায়।

এরপর তাঁরা কয়েকটি সশস্ত্র ডাকাতি করেন তার কারণ অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজন। ১৯১৫ সালে গার্ডেনরীচে বার্ড কোম্পানীতে ১৮০০০ হাজার টাকা লুট হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারী একজন চাল ব্যবসায়ীর ক্যাশিয়ারের নিকট থেকে ২০০০০ হাজার টাকা লুট হয়। তৃতীয় ডাকাতি হয় ২রা ডিসেম্বর কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের এক চাল ব্যবসায়ীর আড়ত থেকে নেওয়া ২৫০০০ হাজার টাকা। ওদিকে যতীন ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের খুঁজে না পাওয়া যাওয়ায় পুলিশ অধৈর্য্য হয়ে পড়ল। অবশেষে পাথুরিয়া ঘাটে অন্য একনামে ভাড়া করা বাড়িতে তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের পাওয়া গেল। নীরদ হালদার নামে এক গুপ্তচর হঠাৎ বাড়িতে ঢুকে বলে 'যতীন তুমি এখানে'? সঙ্গে সঙ্গে যতীন তাঁকে গুলি করেন। ডাইং ডিক্লারেশনে সে লোকটা যতীনেরই নাম করে। দেখা গেল আর কলকাতায় থাকা তাঁদের পক্ষে নিরাপদ নয়। তিনি দলবল নিয়ে চলে যান বালেশ্বরের কাপ্তি পোতায়। এরপর মেডারিক

জাহাজের অস্ত্রশস্ত্র নামানোর জন্য তাঁরা প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে এক বিয়োগান্তক নাটক অভিনিত হতে দেখলাম। পূর্ব বন্দোবস্ত মত এল না এস. এস. মেডারিক। এদিকে কলকাতায় ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশ খবর পেল স্থানীয় লোক নয়, এমন লোকেরা বালেশ্বর ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামে মাঝে মাঝে যাতায়াত করছে এই খবর পেয়ে সর্বোচ্চ এবং পদস্থ গোয়ান্দা পুলিশেরা বালেশ্বরে এসে পড়ল। ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামে ১৯১৫ সালে ৫ই সেপ্টেম্বর থানা তল্লাসী করা হল এবং মেঝেতে কতকগুলো কাগজ পাওয়া গেল। নীলগিরি থেকে ময়ূরভঞ্জের সঙ্গে লাগোয়া শুধু মাঝখানে একটি স্রোতস্বতী। বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিরাট এক পুলিশ বাহিনী এবং তার সঙ্গে কলকাতা থেকে আগত অফিসারদের নিয়ে কাপ্তিপোতার দিকে রওয়ানা হল। ৬ই সেপ্টেম্বরে গ্রামাঞ্চলে প্রচুর ইউরোপীয়ান ও কলকাতা থেকে প্রচুর পুলিশ বাহিনী দেখে একটি লোক সাধুর (যতীনকে) প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ তাঁকে ও তার দুজন সঙ্গীকে খবর দিয়ে দিল।

যতীন্দ্র মুখার্জী, চিত্তপ্রিয় চক্রবর্ত্তী ও মনোরঞ্জন গুপ্ত গ্রাম ছেড়ে তালদিঘির দিকে চললেন নীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও জ্যোতিষচন্দ্র পালের সঙ্গে মিলিত হতে। এরপর তাঁরা ঠিক করলেন বালেশ্বর রেলষ্টেশনের দিকে যাবেন। কিন্তু তখন সকল পথ অবরুদ্ধ এবং চারিদিকে রটিয়ে দেওয়া হয়েছে, একদল বাঙ্গালী ডাকাত এদিকে এসেছে, তাদের ধরবার জন্য স্থানীয় অঞ্চলের মানুষকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। সুতরাং সাধারণ লোকও এদের বিরুদ্ধে। অনেক নদীনালা, খাল, বিল পার হয়ে শেষ পর্যন্ত যতীন তার দলবল নিয়ে এগোচ্ছিলেন। এদিকে

ইতিমধ্যে বালেশ্বর থানায় খবর দিয়ে এসেছিল দফাদার। ৯ই সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর রোড এবং ময়ূরভঞ্জ রোড তুদিক থেকে পুলিশ তুদলে বিভক্ত হয়ে বুড়িবালামের তীরে আসতে লাগলো। একজন সাব ইনসপেক্টর একটা সাদা পতাকাও তুলে দিল, এক জায়গায় অর্থাৎ 'জীবন হানি না করে আত্মসমর্পণ কর।'

এ সময় ম্যাজিষ্ট্রেট ১০৩ রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়ে জানিয়ে দিল তাদের কাছে লঙ রেঞ্জের রাইফেল আছে। কাজেই আত্মসমর্পণ করাই সমীচীন। কিন্তু জবাব এল গুলিতে। উভয় পক্ষেই এই গুলি বিনিময় চলল প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে। এরপর ম্যাজিষ্ট্রেট গুলি চালানো বন্ধ করবার আদেশ দিলেন। পুলিশ এগিয়ে গিয়ে দেখে চিত্তপ্রিয় মারা গেছে এবং যতীন ও জ্যোতিষ আহত হয়েছে। যতীনের তলপেটে গুলি লাগে, বাঁ হাতেও লাগে। হাতখানার হাড় একেবারে অকেজো হয়ে যায়। পরদিন তিনি মারা যান। পরে স্পেশাল ট্রাই বুনেলের বিচারে মনোরঞ্জন ও নীরেনের ফাঁসি হয় ২২শে নভেম্বর। জ্যোতিষের চোদ্দ বছর জেল হয়। কিন্তু তিনি পরে বহরমপুরের জেলে মারা যান।

একটা কথা বলতেই হয় বাংলা দেশে যেমন বিপ্লববাদী যুবকদের অভাব হয়নি কোনদিন, তেমনি বিশ্বাসঘাতকদের বা মীরজাফরদের অভাব হয়নি কোনদিন। যদি বাঘা যতীন এবং তাঁর সঙ্গীরা বিশ্বাস-ঘাতকতার শিকার না হতেন, তবে তাঁরা অকালে মরতেন না। কুমুদ মুখার্জী নামে একজন লোক এঁদের সমস্ত পরিকল্পনাটা কর্তৃপক্ষকে বলে দিয়েছিল।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীন, মনোরঞ্জন গুপ্ত, চিত্ত-প্রিয় চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং জ্যোতিষ চন্দ্র পাল বুড়িবালামের

ঘাটে যেন ইংরেজ ভারতে হলদিঘাটের যুদ্ধ করলেন। এঁদের মত, বিশেষ করে বাঘা যতীনের মত সম্ভাবনাময় জীবনের এভাবে পরিসমাপ্তি কিছুদিনের জন্য হলেও ভারতীয় রাজনীতিতে একটা শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল।

আজ যখন দেখি বাংলাদেশের অনেক ছেলেকে বাঘা যতীনের পুরো নাম বলতে পারে না, তখন লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায়। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে বাঘা যতীন আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। বাঘা যতীনকে যদি আমরা ছোটদের সামনে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরতে পারি, তবে ভারতে আজ বিভিন্ন স্থানে যে সন্ত্রাসবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে তাকে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। বাঘা যতীন যেন জন্মসূত্রেই নেতা। তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভা আমাদের তরুণ সমাজকে আলো দেখাবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। ইতিহাসে বুড়িবালামের যুদ্ধের যথাযথ মূল্যায়ণ হয়নি। আজ সময় এসেছে সর্বস্তরের মানুষের কাছে বাঘা যতীনের বীরত্বের কথা এবং বুড়িবালামের যুদ্ধ তুলে ধরতে হবে, যা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক বিরাট অবদান রেখে গেছে।

বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত ও তাঁর সংগ্রামী জীবন

উল্লাসকরের নাম খুব কম মানুষই শুনেছেন। কারণ তিনি আত্ম-প্রচার ঘৃণা করতেন। উল্লাসকরের জীবন বৈচিত্র্যময় জীবন। ফাঁসির আসামী উল্লাসকরকে আগামী প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে চাই যাতে তারা রাজনৈতিক অবক্ষয়ের যুগে মানুষের মত মানুষ হয়ে দেশকে ভালবাসতে শেখে। দেনা-পাওনার রাজনীতি সে যুগে ছিল না, সেই যুগে মেধাবী ছাত্র উল্লাসকর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে।

১৮৮৫ সালের ১৬ই এপ্রিলে উল্লাসকর দত্ত ত্রিপুরার কালিকচ্ছ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বৈদিক সাহিত্যে পণ্ডিত দ্বিজদাস দত্ত সর্ব প্রথম এদেশে কৃষি বিদ্যা অধ্যয়ণ করতে লণ্ডন যান। ইনি একজন ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সভ্য ছিলেন। দ্বিজদাসের ইচ্ছা ছিল পুত্রকে একজন উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিত করে তুলবেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে উল্লাসকর এণ্ট্রান্স পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। উল্লাস-করের মনে এ সময় দেশ প্রেমের বীজ উপ্ত হচ্ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে একটা ঘটনা তাঁর জীবনকে নতুন খাতে বইয়ে নিয়ে গেল। কলেজের ক্লাসে একজন ইংরেজ অধ্যাপকের অপমানকর উক্তিতে তিনি প্রতিবাদ করে ওঠেন এবং কলেজ ছেড়ে স্বদেশী বিপ্লবী দলে যোগ দেবেন স্থির করেন। এ সময় থেকে তিনি বিলাতী পোষাক ছেড়ে ধুতি পরা এবং সাধারণ বাঙ্গালীর জীবন যাপন শুরু করেন।

যাহোক এরপর কলেজ ছাড়ার পর বারীন ঘোষের বিপ্লবী দলে

যোগ দেন এবং সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে ওঠেন। তিনি দেশ মাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে এতই আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন যে, শয়নে স্বপনে দেশের মুক্তি তাঁর ধ্যান জ্ঞান হয়েছিল।

সঙ্গীতে ও ক্যারিকেচারেও ছিল তাঁর সমান দক্ষতা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়। তিনি সেই আন্দোলনেও সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯০৮ সালের ২রা মে তিনি মুরারীপুকুর বাগান বাড়িতে ধরা পড়েন। তবে ১৯০৯ সালে আলিপুর বোমার মামলায় তাঁর ও বারীন ঘোষের ফাঁসির আদেশ হয়। এরপর আপিল করা হলে তাঁদের দ্বিপান্তরিত করা হয়। হাসি মুখে উল্লাসকর সেই শাস্তি মেনে নেন। দেশের মুক্তির জন্য যে শাস্তি তাকে দেওয়া হয়েছে তাকে তিনি গৌরবের মনে করতেন। তবে আন্দামানে শোষকের নিষ্ঠুর অত্যাচারে তাঁর স্বাস্থ্যটা নষ্ট করে দিয়েছিল। অবশেষে ১৯২০ সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে মুক্তি দেন।

জেল থেকে মুক্তি পাবার পর আশা করা গিয়েছিল যে উল্লাসকর আবার সক্রিয় রাজনীতিতে নামবেন। কিন্তু জেলে তাঁর উপর ১৯০৯ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত যে অমানুষিক অত্যাচার হয়েছিল তা বলার ভাষা নেই। তাই দেখলাম ১৯২০ সালের পর তিনি তেমন কোন সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন নি।

এরমধ্যে তাঁর জীবনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। আন্দামানে বৃটিশ সরকার তাঁর মানসিক ভারসাম্য কিছুটা নষ্ট করেছিল। ১৯৪৮ সালে বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পালের বয়স্কা বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন। এসময় উল্লাসকরের বয়স হয়েছিল ৬৩ বৎসর। তিনি যে বিবাহ করেছিলেন তা আত্মসুখের জন্য নয়। বিপিন পালের কন্যাকে লোভী

মানুষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য এই বিবাহ। যাইহোক বিবাহিত জীবন মোটের উপর সুখের ছিল না। বিবাহের পর স্ত্রীকে নিয়ে আসামের শিলচরে বসবাস শুরু করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনসন গ্রহণ করতেও পারেননি তিনি।

উল্লাসকর লেখক হিসাবেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর লিখিত বই 'দ্বীপান্তরের কথা' 'আমার কারাজীবন' এর মধ্যে বিপ্লবীদের কারাজীবন সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা দেয়।

উল্লাসকরের জীবন এমনই ঘটনা বহুল যে তার সম্পর্কে বলে শেষ করা যাবে না আর তাঁর জীবনের অনেক অংশই এখনও উদঘাটিত হয় নি। অবশেষে ১৯৫৫ সালের ১৭ই মে উল্লাসকরের জীবনাবসান হয়।

আজ উল্লাসকরের জীবন আলোচনা করে দেখা যায়, অর্থের কাছে বিত্তের কাছে উল্লাসকর কোনদিন মাথা নত করেন নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সতন্ত্র সৈনিক পেনসন তিনি গ্রহণ করেন নি। উল্লাসকর আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন আগামী দিনের সংগ্রাম। যে সংগ্রাম ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার সংগ্রাম যা আমাদের করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

আজ একটি কথা আমাদের মনে হয় যে এখনও কিন্তু মানুষ আছেন যারা বেশ মুখরোচক ভাবেই বলেন উল্লাসকরের মত মানুষরা কি এমন কাজ করেছেন। উত্তরে বলি তিনি যে ভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, তা হয়তো আজকের পরিপ্রেক্ষিতে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে নিষ্ঠা এবং অকপটতা দেখতে পাই, তা আজও আমাদের উদ্দীপ্ত না করে পারে না। যারা এই বিপ্লবীদের মানসিকতা

স্বীকার করেন না, তারা অন্ধকারের দর্শন প্রচার করেন। এদের মধ্যে মানুষের বীরত্বের কাহিনী আকর্ষণ করে না এবং অন্যায়ের কাছে, প্রবলের সামনে নিরীহ মানুষকে অবনত অবস্থায় দেখতেই এরা দার্শনিক তৃপ্তি পান।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, সেই সমস্ত কাহিনী আলোচনা না করাই ভালো, যেখানে দেখা যায় মানুষের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা আর আত্মসমর্পণের কাহিনী। তাই উল্লাসকরের জীবন আমাদের আকৃষ্ট করে, কারণ তার রাজনৈতিক জীবন এবং গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে ছিল না কোন কপটতা, এটাই তাঁর জীবন নিয়ে আলোচনার সদর্থক দিক

ননীবালা দেবী—এক মহীয়সী বিপ্লবী নারী

এদেশে যে খণ্ডিত স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, সেটি অর্জন করতে অনেক জীবন যৌবনকে আত্মোৎসর্গ করতে হয়েছে। আমাদের দেশের তরুণ তরুণীদের কাছে মহিলা বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের ছবি তুলে ধরবার তেমন প্রচেষ্টা দেখা যায় না। তবে ইদানীং মাতঙ্গিনী হাজরার জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এটা আশার কথা। তবে বিপ্লবী ননীবালা দেবী সম্পর্কে খুব কম লোকেরই জানা আছে।

১৮৮৮ সালে হাওড়া জেলার বালীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ননীবালা। তাঁর পিতার নাম সূর্যকান্ত বন্দোপাধ্যায়। তাঁর পিতা তাঁকে এগারো বছর বয়সে বিবাহ দেন এবং ষোল বছর বয়সে তিনি বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসেন।

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাগত। ইতিমধ্যে বিপ্লবী যুগান্তর দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের কর্মদ্যোগের সঙ্গে নিজেকে সামিল করেন ননীবালা দেবী। এসময়ে তাঁর সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা নেন। ননীবালার জীবন যেমন ঘটনা বহুল তেমনি বৈচিত্রপূর্ণ। ১৯১৫ সালে আলীপুর জেলে আবদ্ধ এক রাজবন্দীর নিকট থেকে গুপ্ত সংবাদ আনার জন্য তিনি ঐ বন্দীর স্ত্রী সেজে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সেখানে গিয়ে দেখা করেছিলেন। আবার কখনও কখনও পলাতক আসামীদের নিরাপদ আশ্রয়দানের জন্য গৃহকর্ত্রীর বেশে দিন কাটিয়েছেন। পুলিশের

সন্দেহদৃষ্টি তাঁর উপর পড়লে তিনি পেশোয়ারে চলে যান। সেখানে কলেরা রোগে শয্যাশয়ী অবস্থায় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে কাশী জেলে নিয়ে আসে। সেখানে এমন কোন অত্যাচার নেই, যা এই বিধবা রমনীর উপর করা হয়নি। কথা আদায় করার নামে ননীবালা দেবী কে উলঙ্গ করে ইংরেজের পুলিশ সেদিন যে পৈশাচিক অত্যাচার চালায়, তাতে সভ্যতাভিমানী ইংরেজের উপর বারে বারে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। তা সত্ত্বেও ননীবালা দেবীর মুখ থেকে একটি কথাও তারা বের করতে পারে নি। অবশেষে পুলিশ তাকে কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠিয়ে দেয়।

যাইহোক অত্যাচারে জর্জরিতা ননীবালা প্রেসিডেন্সী জেলে আসার পর আমরণ অনশন শুরু করেন। বৃটিশ সরকার তাঁকে খাওয়াবার নানারকম চেষ্টা করেও বিফল মনোরথ হন। কোন শর্তে অনশন ত্যাগ করবেন কর্তৃপক্ষ জানতে চাইলেন। তাতে ননীবালা লিখিত এক দরখাস্ত দেন। তাতে লেখেন যে বাগবাজারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরহংসদেবের পত্নী সারদাদেবীর কাছে তাঁকে রাখলে তিনি খেতে পারেন। কিন্তু ইংরেজ পুলিশ অফিসার সে দরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলেন। সাহেব পুলিশ অফিসার তাঁর দরখাস্তের অপমান করার পর যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন তিনি সাহেবের গালে সশব্দে একটি চড় বসিয়ে দেন। তাঁর সাহস দেখে সেদিন ইংরেজ পুলিশরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

এরপর ১৯১৮ সালে ননীবালা দেবীকে ৩নং রেগুলেশন আইন অনুযায়ী প্রেসিডেন্সী জেলে ষ্টেট প্রিজনার হিসাবে আটক রাখা হয়। শেষ পর্যন্ত একুশ দিনের অনশনের পর তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। তিনিই বাংলার একমাত্র ষ্টেট প্রিজনার।

অবশেষে ১৯১৯ সালে তিনি জেল জীবন থেকে মুক্তিলাভ করেন। জেল থেকে মুক্তির পর তিনি নানা জনহিতকর কাজ করে গেছেন। তবে সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেছেন বলে আমার জানা নেই। স্বাধীনতার পরেও তিনি অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। তাঁর খোঁজখবর আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তেমনভাবে নিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। সম্ভবতঃ ১৯৬৭ সালে তিনি পরলোকগমণ করেন।

সে যুগের এক বালবিধবা ননীবালা দেবী আমাদের নারীজাতির আদর্শ হয়েও কেন বিস্মৃত প্রায় হয়ে গেলেন তা বোঝা দুস্কর। হয়ত আত্মবিস্মৃত জাতি বলেই তা হয়েছে। আমাদের স্বভাবই হচ্ছে অতীতকে ভুলে যাওয়া কারণ ভুলে যেতে আমরা ভালবাসি। নিজের দেশের ঐতিহ্য অস্বীকার করার অর্থ অপমৃত্যু—জাতির অপমৃত্যু ডেকে আনা। তবে আমাদের বিশ্বাস, এখনও তরুণ তরুণীদের সামনে ননীবালার মত মহীয়সী নারীকে তুলে ধরতে পারলে, আমরা অন্যায় আপোষ, ও হীনতাকে এড়িয়ে চলতে পারবো এবং এতে সাময়িক কিছু ক্ষতিস্বীকার করলেও আমরা নৈতিকভাবে জয়ী হবো, এ আশা আমাদের আছে।

অমর শহীদ কানাইলাল ও তাঁর বিপ্লবী ভাবনা

দরিদ্র ভারতবাসীর স্বাধীনতা যেটুকু ছিটে ফোঁটা দেখতে পাচ্ছি তা এসেছে দুটো ধারার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অহিংস ও সহিংস; একথা সঠিকভাবেই অনেকে বলেন যে কোটি কোটি আতঙ্কিত দেশবাসীর মনে সাহস সঞ্চার ও শত্রুর আক্রমনের কৌশল দুর্বল করতে গেলে অহিংস পদ্ধতির, যথেষ্ট মূল্য আছে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই গনজাগরনের উপায় হিসাবে অহিংস আন্দোলন খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছে এবং অহিংস আন্দোলনে ইংরেজ বুর্জোয়া শ্রেনীর কাছ থেকে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা এদেশের মানুষের জন্য আদায় করা সম্ভব ছিল। পাশাপাশি এই আন্দোলনে যে আপোষমুখীতা ছিল যা মূল্যতঃ অহিংস আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল, তাই আবার আন্দোলনের প্রাণশক্তি নষ্ট করতে সাহায্য করেছিল। স্বাধীনতার পরে বৃটিশ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এটলীর মুখে শোনা যায় গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের প্রভাব তাদের উপর Minimal হয়েছিল বা যৎসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমরা বারে বারে দেখেছি, যখন আন্দোলন উত্তাল হয় উঠেছে, হিংসার অজুহাতে গান্ধীজী সে আন্দোলন থামিয়ে দিয়েছেন। চৌরিচোরার ঘটনা, ১৯৩১ এর ঘটনা সে কথাই প্রমাণ করে। অন্যদিকে আরেক শ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামীদের দেখতে পাই যাঁরা শুধু মুক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণই নয়, সহিংস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্য বাদীদের সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ণ স্বাধীনতার

পতাকা ভারতের মাটিতে উড্ডীন করতে চাইতেন। এঁরা হলেন শহীদ ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘাযতীন, ভগৎ সিং এবং সূর্য সেন। এঁদের শিক্ষা আমাদের নির্দ্দেশ দেয় বিদেশী দাসত্ব শেষ করো, দরিদ্র শোষিত শিক্ষাহীন ভারতবাসীর জীবন শেষ হোক শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে দেশ ভরে উঠুক। এই মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীরা বুঝে ছিলেন শূন্যহাতে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিলে বৃটিশ এদেশ থেকে কোনদিন যাবে না। কারণ তারা তো, যেতে আসেনি, এসেছিল এদেশ লুণ্ঠন করতে। যত-দিন সম্ভব হয়েছে লুণ্ঠন করেছেন। তারা চেয়েছিল অহিংস আন্দোলনের শিকড় এদেশে পাকাপোক্ত হোক এবং তাহলেই সেই আন্দোলন চললেও তাদের দেশ শাসন করতে অসুবিধা হবেনা। এ বিষয়টা আমাদের বিপ্লবী যুবকদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। তাই অমর শহীদ ক্ষুদিরাম, কানাইলাল ইত্যাদিরা বুঝতে পেরেছিলেন অত্যাচারী বৃটিশদের বিতাড়িত করতে গেলে অস্ত্র হাতে সংগ্রাম করতে হবে। বুলেটের জবাব বুলেট, নিজেদের আত্মদান করে মানুষকে জাগাতে হবে।

আজ শহীদ কানাইলাল দত্তের জন্ম শতবর্ষের সাথে সাথে আমরা ভারতের স্বাধীনতার ৪৩ বছর পূর্ত্তিউৎসব পালন করলাম, তখন ভারতবাসী হিসাবে আমার প্রশ্ন জাগে—এ স্বাধীনতাই কি আমাদের শহীদ কানাইলাল চেয়েছিলেন যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করছে, কোটি কোটি যুবক যুবতী বেকার ও হতাশায় মৃয়মান, সামনে কোন ভবিষ্যত নেই। দেখছি কোটিপতিদের সম্পদ বছরে বছরে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, আর গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী শাসক গোষ্ঠীরা পদে পদে গণতন্ত্রের উপর বলাৎকার করছে। জাতিগত

দ্বন্দ্বে সারা দেশ টুকরো টুকরো হতে চলেছে। আজ রক্ষক ও ভক্ষক-রূপী শাসকদের হাত থেকে ক্ষমতার চাবি ছিনিয়ে নিতে হবে এবং শোষিত মানুষদের নিয়ে প্রস্তুত করত হবে বিপ্লবী মহামোর্টা। আজ সমাজ সচেতনতার দিন, সংগ্রামের দিন।

সশস্ত্র সংগ্রাম এবং অহিংস সংগ্রামের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আর একটি ধারা যুক্ত হল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং সেই-সঙ্গে শ্রমিক ধর্মঘট। জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশের কোন কোন অংশে শুরু হল কৃষক আন্দোলন। সেই সঙ্গে দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণ গণতন্ত্রের দাবীতে কোথাও কোথাও শক্তিশালী আন্দোলন আরম্ভ করেছিল, এই সংগ্রামগুলি পরবর্ত্তীকালে বৃটিশ সরকারকে নানা প্রতিকূল সমস্যার সম্মুখীন করেছিল।

শহীদ কানাইলালকে নিয়ে কিছু আলোচনা করতে গেলে মনে রাখতে হবে বৃটিশ অধিকৃত বিশাল ভারতবর্ষে ফারসীদের ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচটি ভূখণ্ড; যেমন—চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, কারাইকাল, মাহে ও ইয়ানাম। কলকাতার অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র শহর চন্দননগর, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনধারার সঙ্গে বাংলার তথা ভারতের নাড়ীর যোগ ছিল বরাবরই। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ও ফরাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্বকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন বাংলার সমগ্র বিপ্লবীগণ। এখানকার সংগ্রামী মানুষেরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংরেজকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে পারলে ফরাসীদের তাড়ানো অতি তুচ্ছ ব্যাপার।

এইরকম এক পটভূমিকায় যখন স্বদেশী আন্দোলন দিকে দিকে দানা বাঁধছে শহীদ কানাইলাল দত্ত ১৮৮৮ সালের ৩০শে আগষ্ট চন্দননগরে

মাতুলালয়ে জন্মগ্রহন করেন। সেদিন সকলের অজান্তে ভারতবর্ষের আকাশে একটি উজ্জ্বল তারার আবির্ভাব ঘটল। কানাইলালের পিতৃ-পুরুষের নিবাস ছিল ঘরসরাই গোবিন্দপুর গ্রামে। তাঁর মায়ের নাম ছিল ব্রজেশ্বরী দেবী। বাবার নাম ছিল চুনীলাল দত্ত। ইনি বোম্বাইএর ভারত সরকাররের একটি দপ্তরে চাকরী করতেন। বোম্বাইয়ে এই কানাইলালের বাল্য শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল। পরে চন্দননগরেই কানাইলাল এণ্ট্রান্স এবং ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষায় পাশ করেন। একথা আমরা জানি হুগলী কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি.এ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পাশ ক।। সত্ত্বেও ফাঁসীর আসামী কানাইলালকে উক্ত ডিগ্রি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেন নি।

পাঠ্যাবস্থায় বিপ্লবী অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়ের মাধ্যমে কানাইলাল যুগান্তরদলের সংস্পর্শে আসেন এবং সক্রিয় কর্মী হিসাবে অচিরেই দেশের সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।

বিপ্লবের রাজনীতি কানাইলালকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বাংলাদেশের বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা অবহিত আছেন তাঁরা সকলেই জানেন যে এই আন্দোলনের মধ্যে মধ্যবিত্ত হিন্দুঘরের ছেলেরাই বেশী ছিলেন। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই দলীয় কর্মীদের উগ্র হিন্দুয়ানীর জন্য দেশের অধিকাংশ মুসলমান জনসাধারণ বিপ্লব আন্দোলনের পথ থেকে দূরে সরেছিলেন। তবে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বিপ্লবীরা ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহবাদী ছিলেন। ঐ সময় বিপ্লবীরা প্রায় সকলেই 'গীতা' সহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। শুনতে পাওয়া যায় কানাইলালের সেরকম কোন আগ্রহ ছিল না।

আমরা জানি আলিপুর বোমা মামলার রাজসাক্ষী নরেন্দ্র গোঁসাই আমাদের কাছে ধিকৃত পুরুষ। কোন রকম পাপ খণ্ডনের চেষ্টা না করেও একথা বলা যায় নরেন্দ্র গোঁসাই শুধু স্বীকারোক্তি করেছেন এ ধারণা ভুল! এর আগেও শ্রীঅরবিন্দের ভাই স্বয়ং বারীন্দ্রনাথও পুলিশের কাছে গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতেই পুলিশ নরেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করেছিল। তবে বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তিতে শ্রীঅরবিন্দের কোন খবর দেওয়া হয়নি। নরেন্দ্রর স্বীকারোক্তিতে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কিত বহু গোপন তথ্য পুলিশের হাতে চলে আসে। তাই বলা যায় প্রাক্তণ বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ গোঁসাই শেষ পর্যন্ত আদর্শভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। সেদিক থেকে চিন্তা করতে গেলে এটাও বিপ্লব আন্দোলনের একটা বড় ট্র্যাজেডি। সম্ভবত রাজনৈতিক আন্দোলন যদি জনমুখী না করা যায় তবে এজাতীয় ব্যাপার ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তাই শোনা যায় শ্রীঅরবিন্দ শেষের দিকে ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি খুব একটা ভালো চোখে দেখতেন না। বারীন ঘোষ কোন এক সময় বলেছিলেন "I do not believe that political murder will bring about our desired degeneration of our mother land" যাইহোক এসব কথা তাঁরা বিভিন্ন সময় বললেও, মনে রাখতে হবে তাঁরাই সন্ত্রাসবাদ রাজনীতির উদ্গাতা ছিলেন। আর ভুললে চলবেনা যে এই রাজনীতি আমাদের দেশের জীবনে একাধারে অনেক লাঞ্ছনা এবং গৌরব বহন করে এনেছিল। ইংরেজ সরকার প্রথম অবস্থায় স্রেফ দমন পীড়নের মধ্যে এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হবেন বলে মনে করেন। মুরারীপুকুর বাগান বাড়ি থেকে একদল উগ্রপন্থী যুবককে গ্রেপ্তার করার পর বাংলাদেশের

একদা লেফ্‌টেনেন্ট গভর্ণর স্যার এনড্রু ফ্রেজার লর্ড মিন্টোকে লিখেছিলেন (তাং ১৯শে মে, ১৯০৮) যে বোমার রাজনীতি এদেশের মাটীতে নির্মূল হল। আমরা সকলেই জানি এই ইংরেজ ভদ্রলোকের আস্ফালন অচিরেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। মুরারীপুকুর গ্রেপ্তারের ঘটনার মাত্র চার মাসের মধ্যে নরেন্দ্র গোঁসাই বিপ্লবীদের হাতে ৩১শে আগষ্ট, ১৯০৮ সালে নিহত হন। এর পরের বছর কলকাতায় ওভারটুন হলে জিতেন রায় চৌধুরী নামে একজন বিপ্লবী ফ্রেজারে প্রাণনাশ করতে ব্যর্থ হন। যদিও সে যাত্রায় ফ্রেজার রক্ষা পেলেন কিন্তু ক্ষুদিরামকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন যে বিশ্বাস ঘাতক দারোগা নন্দলাল ব্যানার্জী তিনি প্রাণে বাঁচতে পারেন নি। ইনি নিহত হন ৯ই নভেম্বর ১৯০৮ সালে এবং মাত্র তিন মাস পরেই ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৯ এ সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা করা হয়। এর কিছুদিন পর বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ দিতে হল পুলিশ অফিসার সামসুল আলমকে। এতগুলো হত্যাকাণ্ড পরপর ঘটে যাওয়ায় সরকার রীতিমত বিচলিত বোধ করতে শুরু করল।

কানাইলাল দত্ত সম্পর্কে বলতে গেলে এককথায় বলা যায় তিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞা এবং প্রাণশক্তিরই মূর্ত্ত প্রতীক। আলিপুর জেলে যখন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি। কিন্তু এই অল্পবয়সেই যে অদম্য সাহসিকতার জোরে সহবিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথকে সঙ্গী করে জেল প্রাঙ্গনের মধ্যেই সহস্র প্রহরী বেষ্টিত রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথকে হত্যা করেন তা রীতিমত রোমাঞ্চকর ও বিস্ময়কর।

নরেন্দ্রনাথকে হত্যা করার দিনটি ছিল ১৯০৮ সালের ৩১শে আগষ্ট। নরেন্দ্রকে হত্যার অপরাধে কানাইলাল এবং সত্যেন্দ্রকে অনতিবিলম্বে

দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হয়, দিনটি ছিল ১লা সেপ্টেম্বর ১৯০৮। আদালতের জুরি অধিকাংশের মত অনুযায়ী কানাইলালকে হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত করলেও সত্যেন্দ্রকে অব্যাহতি দেওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এফরো জুরিদের পরামর্শ গ্রহণ না করে অভিযুক্ত উভয় ব্যক্তিকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

দায়রা আদালতে কানাইলালকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি ইতি-পূর্বে তাঁর দেওয়া কোন স্বীকারোক্তি অংশতঃ বা পূর্ণত প্রত্যাহার করে নিতে ইচ্ছুক কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি একইরকম দৃপ্তভঙ্গীতে জবাব দেন—"Which part? The part in which I said that I and Satyendra were responsible for the murder of Narendra? I wish to say that I alone am responsible and no one else. No one else knew of the fact."

কানাইলালকে জেলের মধ্যে কে বা কারা অস্ত্র সরবরাহ করেছিল, এ আলোচনা আজ নিরর্থক! তবে যতদূর জানা যায় চন্দননগরের প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্রীশ ঘোষ এবং বসন্ত ব্যানার্জীই জেলের প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে কানাইলালকে অস্ত্র যোগান দিয়েছিলেন।

ইংরেজের দুর্ভেদ্য বন্দীশালার মধ্যে অন্তরীণ অবস্থায় যেভাবে সুপরিকল্পিতভাবে দুজন তরুণ যুবক তাঁর মত মৃত্যুকামনা করেছিল। তাঁর মরদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সময়ে পথের দুধারে হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধানিবেদন করেছিল, তারা মুহুমুহু জয়ধ্বনি দিয়েছিলেন কানাইলালের।

শ্রীঅরবিন্দ কানাইলালের মৃত্যুতে যে উক্তিটি করেছেন তা

আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন : "I found myself among those youngmen and in many of them I discovered a mights coverage, a power of self effacement in comparison with which I was simply nothing" নিশ্চিন্তে নিদ্রারত কানাইলালকে ১০ই নভেম্বর, ১৯০৮ ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠিয়ে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে আসা হল। আইরিস জল্লাদ প্রাইসের দিকে চেয়ে স্মিতহাস্যে কানাইলাল প্রশ্ন করলেন "How do you find me now ?" প্রাইস অভিভূত। কয়েকদিন আগে কানাইলালের নিশ্চিন্ত ভাব দেখে তাঁকে টোকা মেরে বলেছিলেন—"ফাঁসির সময় দেখব তুমি কেমন নিশ্চিন্ত থাকো।" প্রাইস নীরবে কর্তব্য শেষ করেছিল, এত অনায়াসে জীবন দেওয়া সে কখনও দেখেনি।

কানাইলাল সম্পর্কে বারীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখেছেন "মরণের আকাশ পথ চাওয়া দিনগুলি সে (কানাইলাল) ঘুমাইয়া ও গীতা পড়িয়া কাটাইত। এই নিষ্কাম অনাবিল শান্ত সমর্পণের জীবনে তাহার চুলগুলি হইয়াছিল বড় বড়। মুখশ্রী হইয়াছিল দীপ্ত ও ঢল ঢল ওজনে সে অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছিল। মরিবার প্রাতে চারটায় তাহাকে বধ্য মঞ্চে লইতে আসিয়া সকলে দেখিল, সে অকাতরে ঘুমাইতেছে। একটি ঘুম হইতে জাগরণ, আরেকটি দীর্ঘতম নিবিড়তম ঘুমের জন্য। তাহার পূর্বদিন সন্ধ্যায় উঠানে বেড়াইতে বাহির হইয়া সে আমার এবং অনেকের কুঠুরির সামনে দাঁড়াইয়া স্মিতহাস্যে বিদায় নমস্কার করিয়াছিল, সেদিন প্রহরীরা বাধা দেয় নাই, পরন্তু আমাদের উঠানের দরজা মুক্ত রাখিয়াছিল। সে সহাস্য প্রসন্ন জ্যোতির্ময়রূপ আমি কখনও ভুলিব না, কানাই তখন মহাতাপস, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী

পথ ভুল হউক, আর সত্য হউক, তাহার সে মরণের মহত্ত্ব যাইবার নয়।”

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন “আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের বাঁচবার জন্য সঙ্গতি রেখে গেছেন। কিন্তু আমাদের যুদ্ধজয়ের ইতিহাস নেই। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাই বীরের মত মৃত্যুবরণ করে মরার মত কোন প্রেরণা আমাদের জন্য রেখে যাননি।” কিছুটা সত্যবটে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটা যখন আমরা শুনি আমাদের মত বৈপ্লবিক চেতনা সম্পন্ন মানুষদের বুকে ব্যথা লাগে। কিন্তু কানাইলালের মত অসংখ্য বীর শহীদের কথা যখন স্মরণ করি তখন মনে হয় এঁরাই আমাদের জন্য চরম আত্মত্যাগ করবার প্রেরণা দিয়ে গেছেন। এঁরা হয়ত যুদ্ধ জয় করেননি, কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যু কত অবহেলায় বরণ করেছেন। ডিরোজিওর ভাষায় বলতে গেলে “Live and die for truth” শব্দগুলির সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে কানাইলালের মধ্যে।

আজ আমাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে বিদেশী শক্তি না থাকলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে ঘাতকের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। একথা দলমত নির্বিশেষে সকলেই জানেন সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী আপোষ করেননি বলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সত্তরের ইন্দিরা আর আশির ইন্দিরার মধ্যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। আজ দেখছি একদিকে অর্থনৈতিক শোষণ, সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে, অন্নহীনের কান্না, বেকারত্বের জ্বালা সব মিলিয়ে ভারতবর্ষের মানুষের ধৈর্য্য শেষসীমায় এসে পৌঁছেছে। তাই কানাইলালদের মত আত্মত্যাগী সন্তানদের আবার আবির্ভাব প্রয়োজন ভারতবর্ষের মাটীতে। জানি না ভারতমাতা

কাবে আবার এসব সন্তানদের আমাদের দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য অর্থাৎ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করার জন্য উপহার দেবেন।

এই মুহূর্তে কানাইলালের জন্মের শতবর্ষে দাঁড়িয়ে শোষণমুক্ত স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গড়ার শপথ নিতে পারলেই তাঁর স্মৃতিতর্পণ সার্থক হবে।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা উল্লেখ করে এই বীর শহীদ কানাই-লালের প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন শেষ করব।

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যতমূল্য সেকি ধরার ধূলায় হবে হারা।"

না ধরার ধূলায় হারা হবে না। ভারতবর্ষে আবার বিপ্লবী দামাল ছেলেরা এসে মেকী বিপ্লবীদের সরিয়ে দিয়ে নূতন ভারত তৈরী করবে, সেখানে থাকবে না কোন অবিচার, নিপীড়ন অত্যাচার এবং হতাশা। নূতন সূর্য উঠবেই একদিন॥

স্বাধীনতা সংগ্রামে ক্ষুদিরামের আত্মবলিদান

ক্ষুদিরাম বসুর কথা বলতে গেলে যে কথা এসে পড়ে তা হচ্ছে, তিনি আত্মকেন্দ্রিকতা মুক্ত সম্পূর্ণ মানুষ। দেশের মুক্তি সংগ্রামের যিনি সৈনিক তাঁর কাছে ব্যক্তিগত সুখ, দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা গৌণ। ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়ের রাজনীতি যখন আজকে আমাদের জীবনকে কালিমালিপ্ত করছে, তখন ক্ষুদিরামের মধ্যে দেখতে পাই অপরিসীম ভালবাসার রাজনীতি। নিজেকে নিয়ে তাঁর কোন চিন্তা ছিলনা। থাকলে এভাবে তাঁর মৃত্যু হত না। মাও সেতুং এক জায়গায় বলেছেন, পৃথিবীর মহত্তম শিল্প হল একটি সুন্দর সমাজ নির্মাণ করা। ক্ষুদিরাম স্বাধীনতা যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়ে তাঁর দেশ ভারতবর্ষে একটি স্বাধীন, মুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ নির্মাণ করবার কল্পনা করতেন, আর তাই স্বাধীনমুক্ত সমাজের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে দেশকে সর্বাগ্রে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা।

ক্ষুদিরাম বসু যে সময় ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এসেছিলেন তখন সেটা ছিল পরাধীন যুগ। বিদেশী বণিকের শাসনের যুগ। সে সময়ে বিদেশী শাসনের লৌহ শৃঙ্খল চূর্ণ করবার জন্য বাংলার গ্রামে গ্রামান্তরে গড়ে উঠেছে বিপ্লবী সংগঠন, আর যে দামাল ছেলেরা এই সংগঠনগুলোর চালিকা শক্তি, তাঁদের মধ্যে ক্ষুদিরামের নাম এসে পড়ে পুরোভাগে। আমরা জানি ১৯০৮ সালে মে মাসে মজঃফরপুর বোমা বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে মানিকতলার বিপ্লবীদের ধরপাকড় ও বিচার

শুরু হলে এদেশে বৈপ্লবিক কর্মযজ্ঞে ভাটা পড়ে, রাজনৈতিক আন্দোলনও তখন কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। ইংরেজ সরকারের দ্বিবিধ নীতির তোষণ ও সংহারের ফলে দেখা গেল রাজনৈতিক আন্দোলনের শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এইসঙ্গে দেখা গেল নরমপন্থী নেতাদের ইংরেজ তোষণ নীতির অব্যাহত গতি, আর চরমপন্থী নেতারা নিঃক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কারাগারের অন্ধকারে।

কিন্তু তবুও বলবো ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই সত্যেন, চারু, বীরেন নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে এই দুর্ভাগা জাতির মধ্যে আলোর প্রবাহ বইয়ে দিয়ে গেছেন। ক্ষুদিরাম একটা জিনিষ জাতিকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে এদেশের মানুষকে মরে মরে উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল বিশ্বাস করতেন কয়েক পুরুষ ধরে তাদের হয়তো প্রাণ দিয়েই যেতে হবে। আর তখনই কেবল আসতে পারে বিপ্লব, আর এ বিপ্লবই নিয়ে আসবে স্বাধীনতা।

এখন আসল কথায় আসা যাক। যখন বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গুলোর মধ্যে একটা সাজুজ্য বজায় রাখার দরকার হয়ে পড়লো, ঠিক সে সময় স্বামীজীর ভাবধারায় দেশের একদল তরুণ প্রস্তুত হচ্ছেন দেশমাতৃকার পায়ে নিজেদের বলিদান করবার জন্য। প্রকাশ্যে বারীন ঘোষকে গুপ্ত সংগঠনের (যুগান্তর) প্রধান সংগঠক জানলেও আসলে এই সমিতির নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ। এ সময় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন বড়-লাট লর্ড কার্জন। ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই তিনি ঘোষণা করলেন বঙ্গভঙ্গের কথা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদিরামকে আমাদের দেখতে হবে। আজ আমাদের সমসাময়িক অনেকেই স্বীকার করবেন, ছাত্রজীবনে বিশেষ

করে পাঠশালায় ছাত্রাবস্থায় একটি গান আমাদের মাতিয়ে তুলেছিল। আজ জীবন সায়াহ্নেও দেখছি সেই গান আমাদের মনকে নাড়া দেয়। অবশ্য তখনও জানতাম এবং আজও জানি সে গান কার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল এবং গানটি সার্থকতা লাভ করেছিল। গানটি হচ্ছে "একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি"। এটি বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল, যিনি ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন। শুনতে পাওয়া যায় ক্ষুদিরাম ভূমিষ্ঠ হবার পর (৩রা ডিসেম্বর, ১৮৮৯) ওঁর দিদি কয়েকমুষ্ঠি চালের ক্ষুদ দিয়ে ওঁকে কিনে নিয়েছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি ভাইএর নাম দিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। বলাবাহুল্য ক্ষুদিরামের জন্মের পূর্বে তাঁর পিতামাতা কয়েকটি সন্তান হারিয়েছিলেন। তাই এবার তাঁর বোনের হাতে ক্ষুদিরামের লালন পালনের দায়ীত্ব পড়ায় তাঁর পিতা ত্রৈলক্যনাথ বসু খুশী হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ক্ষুদিরামকে তাঁর আর হারাতে হবে না।

ভাগ্যের পরিহাস হচ্ছে এই যে, ক্ষুদিরামকে ধরে রাখা যায় নি। মাত্র পনের বছর বয়সে ক্ষুদিরাম দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তা শুরু হল স্বদেশী পুস্তিকা বিতরণের মধ্য দিয়ে। তখনকার দিনে এটি একটি কঠিন কাজ। প্রকৃত অর্থে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্যে দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু। ১৯০৬ সালে ১লা এপিল ইংরেজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মেদিনীপুর শহরে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফেয়ার উদ্বোধন করতে গেলে ক্ষুদিরাম কয়েকজন বন্ধু সহ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিলে সকলে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে। এর কিছুদিন আগে ২৮শে ফেব্রুয়ারী একজন হেড কনেস্টবল্ পুস্তিকা বিলির জন্য ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

ক্ষুদিরাম তাকে বেশ করে মারধর দিয়ে সরে পড়েছিল। দেশের কাজ করবার জন্য পাছে বাড়ির লোকেরা অসুবিধায় পড়ে সেই কারণে ক্ষুদিরাম একটি বোর্ডিং এ বাস করতেন।

এভাবে যখন ক্ষুদিরামের দিন চলছিল তখন হঠাৎ দুজন সাব-ইন্সপেক্টর এবং জনা দশেক কনেস্টবল রাত একটার সময় বোর্ডিং-এ গিয়ে হাজির। সেটা ছিল ৩১শে মার্চ ১৯০৬ সাল। এ সময়ে বোর্ডিং-এর অন্য সকলে যখন ঘুমে অচেতন, সে সময়ই ক্ষুদিরামকে হাতে হাতকড়ি দিয়ে ওরা নিয়ে গেল। এপ্রিলের ৪ তারিখে ক্ষুদিরামকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হল। ১৯শে এপ্রিল তাঁকে রাজদ্রোহের লিফলেট বিলি করার অপরাধে সেসন জজের আদালতে বিচারের জন্য পাঠানো হয়েছিল। ১৮ই এপ্রিল তাঁকে পুনরায় জামিন দেওয়া হল। বয়সে অপরিণত দেখে ১৬ই মে জজ সাহেব তাকে একেবারে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করলেন। এরপর একে একে ১৯০৭ সালে হাটগাছিয়ার মেলভ্যান লুঠ, তারপর নারারণগড়ে লাটসাহেবের ট্রেন উড়িয়ে দেওয়াতে অংশগ্রহণ করা প্রভৃতি কার্যকলাপে যুক্ত হতে থাকেন।

ক্ষুদিরাম বসু হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি পুলিশকোর্টে অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্' সম্পর্কিত বিচারের প্রহসনের অপমানের জ্বালায় জর্জরিত হয়েছিলেন। ক্রোধে তাঁর মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল। এসময়ে বিপ্লবী সুশীল সেনের উপর কিংস ফোর্ডের পনের ঘা বেত্রদণ্ড দেওয়ার কথায় ক্ষুদিরামের মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল। কিংস ফোর্ড ছিলেন অত্যাচারের প্রতীক।

এসময়ে তাঁর কানে বেজে চলেছে একটি প্রচলিত গান।

বেতমেরে কি মা ভোলাবি
আমরা কি মার সেই ছেলে
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে।

দল থেকে ক্ষুদিরামকে অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে মেরে ফেলার দায়িত্ব দেওয়া হল এবং দীনেশ নামে একটি ছেলেকে কলকাতায় ঘোরালো অবস্থায় ক্ষুদিরামের সঙ্গে দেখা যাবে। এই অবস্থা দেখে ইংরেজরা ইতিমধ্যেই কিংসফোর্ডকে মজঃফরপুরে সেসন জজ রূপে প্রমোশন দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। এবার ক্ষুদিরামের ডাক পড়ল, তাঁকে যেতে হবে মজঃফরপুরে। টাকাও যোগাড় হয়ে গেল অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায়। ক্ষুদিরাম ও দীনেশ রায় ওরফে প্রফুল্ল চাকী ১৯০৮ সালের এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে মারতে মজঃফরপুর পৌঁছে গেলেন। তাঁরা উঠেছিলেন এক ধর্মশালায়। দেখতে দেখতে তাঁদের টাকা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ওঁরা তখন স্থানীয় এক জমিদারের কর্মচারীর নিকট থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন এবং তার সাহায্যেই ধর্মশালায় তাঁদের থাকার সুবন্দোবস্ত করে দিল। যাই হোক এভাবেই এসে গেল তাঁদের সেই দিন—যে দিনের জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন। দিনটি হচ্ছে ৩০শে এপ্রিল। এই দিনেই কিংসফোর্ডের সস্ত্রীক ইউরোপীয় ক্লাবে তাস খেলতে যাবার কথা। এখানে মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি তাস খেলতে আসতেন। বলাবাহুল্য কিংসফোর্ডের বাড়ি কাছেই, তবে কেনেডিদের বাড়ি মাইল খানেক দূরে ছিল। যাইহোক ক্লাব ও কিংস ফোর্ডের বাড়ির মাঝামাঝি জায়গায় ক্ষুদিরাম ও দীনেশ

ওৎপেতে বসে রইলেন। এরমধ্যে একটা বড় ভুল হয়ে গেল। কারণ কিংসফোর্ড আর কেনেডির গাড়ী দুটো একই রকম হবার দরুণ ক্ষুদিরাম ও দীনেশ ওরফে প্রফুল্ল চাকী ঠাহর করতে পারলেন না কোনটিতে কিংসফোর্ড রয়েছেন। তাঁরা বোমা নিক্ষেপ করলেন। চতুর্দিক কেঁপে উঠল, বোমার আঘাতে মিসেস ও মিস কেনেডি মৃত্যুবরণ করলেন, মারা গেলেন না কিংসফোর্ড। একেই বলে ভাগ্য। কিংসফোর্ড বেঁচে গেলেন এযাত্রায়।

এর পরের অধ্যায় আমরা সকলেই জানি। পুলিশ উন্মাদের মত ছোটাছুটি করতে আরম্ভ করল। ক্ষুদিরাম ও দীনেশ দুইবন্ধু দুদিকে চলতে লাগলেন। ক্ষুদিরাম খালি পায়ে কিছু না খেয়ে ২৪ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ওয়াইনি রেল ষ্টেশনের কাছে সকাল ৮ টার সময় যদি কিছু চিঁড়ে মুড়ি জল তিনি খেতে পান, তার জন্য একটি দোকানে এলেন। সেখানেই তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দেয়। তিনি বুঝতে পেরে পকেট থেকে রিভলবার বের করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই তাকে নিরস্ত্র করা হয়। এ সময় ষ্টেশনে প্রচুর লোক জমে যায়। সবাই ক্ষুদিরামকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সন্ধ্যায় তাকে মজঃফরপুরে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর আমরা সেই ১১ই আগষ্ট ১৯০৮ সাল, সেদিন যা হয়েছে তা জানি।

এদিকে ১লা মে দীনেশ সমস্তিপুরে রেল ষ্টেশনে এসে মোকামা-ঘাটের একখানা টিকেট কাটলেন। এরমধ্যে তিনি তাঁর বেশভূষা বদলে ফেলেছেন। নূতন কাপড় জামা এবং জুতো পড়েছেন। দীনেশ যখন ট্রেনে উঠলেন ঠিক সেই সময় পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল

ব্যানার্জী তাঁর ছুটির শেষে মজঃফরপুরের ট্রেন ধরে সিংভূমে পুনরায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। কামরায় বসে নন্দলাল ব্যানার্জী দীনেশের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন, কারণ দীনেশকে তিনি প্রথম থেকে সন্দেহ করেছিলেন। দারগার অনুসন্ধিৎসু মন দীনেশকে বিরক্ত করছিল। তিনি শিমুরিয়া ঘাটে নেমে গঙ্গাজলে একটু তৃষ্ণা মিটিয়ে অন্য একটা কামরায় উঠলেন। পুলিশ অফিসার আবার তাঁর কামরায় এসে তাঁকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে মোকামাঘাটে টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলেন বিশ্বাস ঘাতক দারোগা নন্দলাল ব্যানার্জী। যাইহোক মোকামাঘাটে দীনেশকে গ্রেপ্তার করা হল। কিন্তু তাঁর শারীরীক ক্ষমতা, এতবেশী ছিল যে, তিনি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লেন। সেখানে আগে থাকতে যে দুজন কনেস্টবল প্রস্তুত ছিল তারা ধাওয়া করল। প্ল্যাটফর্মের শেষে গিয়ে দীনেশ দেখলেন...সরে পড়া অসম্ভব। অতএব তিনি কনস্টেবলদের দিকে গুলি চালাতে লাগলেন। তাঁর সবগুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল। এবার তিনি নিজেকে নিজেই গুলি করে বসলেন। সেই সঙ্গে মৃত্যুকে তিনি বরণ করে শহীদ হলেন। পরে দীনেশের মাথা কেটে কলকাতায় পাঠানো হল। পূর্বে বলেছি দীনেশ ওরফে প্রফুল্ল চাকী ক্ষুদিরামের সঙ্গী হিসাবে এসেছিলেন। আজ ক্ষুদিরামের জন্মের শতবর্ষের আলোকে দাঁড়িয়ে ক্ষুদিরামের সঙ্গে প্রফুল্ল চাকীর নাম না করলে ক্ষুদিরামের সম্পর্কে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একথা স্মরণীয় যে দীনেশের মত শারীরীক ক্ষমতার অধিকারী ছেলে বড় একটা দেখা যায় না। দীনেশ ওরফে প্রফুল্ল চাকীকে যুগান্তর দলে এনেছিলেন বিপ্লবী বারীন ঘোষ।

ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকীর বীরত্বপূর্ণ আত্মবিসর্জন শুধু আমাদের দেশের মানুষকে নাড়া দিয়েছিল তাই নয়, সমগ্র ইউরোপে এঁদের ত্যাগের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকমান্য তিলক এঁদের সমর্থন করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন বলে তাকে ছ'বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।

আজ আমরা ভারতবর্ষের ৪৩তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছি, কিন্তু ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকীর স্বপ্নের স্বাধীন ভারতবর্ষ এখনও অনেক দূরে। আজকে প্রতিটি তরুণ-তরুণীকে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর আত্মত্যাগের কথা বারে বারে স্মরণ করতে হবে তাহলেই তারা নিজেদের চিনতে শিখবে।

আমাদের দেশে নৈতিকতার যে অধঃপতন শুরু হয়েছে তাকে রুখতে হলে, অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ না হয়ে উপায় নেই। প্রতি পদে পদে দেখতে পাচ্ছি দেশের মানুষকে অশুভ শক্তির সঙ্গে আঁতাত করতে। একটা যেন স্তাবকতাবাদ আমাদের ঘিরে ধরেছে। জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্ত করে এগিয়ে যাবার যে পথ মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীরা দেখিয়ে গিয়েছেন তাকেই পাথেয় করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, তা না হলে জাতি হিসাবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।

বিপ্লবী সূর্য্য সেনের আত্মত্যাগ

আমাদের দেশ ভারতবর্ষের মানুষের কাছে সূর্য্য সেন নামটির চেয়ে মাষ্টারদা ডাকটি অনেক বেশি প্রিয়। পরাধীন দেশে যিনি আমৃত্যু সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তিনি সূর্য্য সেন বা মাষ্টারদা। মাষ্টারদার বলিষ্ঠ উদাত্তবাণী একদিন অত্যাচারী ইংরেজ শক্তিকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। তিনি বুঝেছিলেন আপোষহীন সত্যনিষ্ঠাই মনুষ্যত্বের পথ।

সালটা ১৯২১। গান্ধীজির ভারত ব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে। বিপ্লববাদীদের কাছে গান্ধীজি আবেদন করেছেন, এক বছর বিপ্লবী কাজকর্ম বন্ধ রাখতে এবং এক বছরের মধ্যে তিনি স্বরাজ এনে দেবেন। মাষ্টারদা ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন এবং তিনি যে শিক্ষকতার কাজটি করতেন তা ছেড়ে দিলেন। অসহযোগ আন্দোলন চলা কালেই নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তীর সহায়তায় তিনি একটি গোপন বিপ্লবীদল গড়ে তোলেন। চট্টগ্রাম শহরের মাঝখানে দেয়ানবাজার "সম্যাশ্রম" নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। আসলে এটি হল আশ্রমের আবরণে একটি বিপ্লবী কেন্দ্র। মাষ্টারদা বিপ্লবী হিসাবে অতি বিচক্ষণ ও সতর্ক, সম্ভাব্য সমস্ত প্রমাণকে তিনি মুছে দিতেন। আপাতদৃষ্টিতে সম্যাশ্রম ছিল কংগ্রেস কার্য্যালয়। এমনি করে দেখতে দেখতে অসহযোগের এক বছর কেটে গেল। উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরার সামান্য ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় অসহযোগ প্রত্যাহার করে নিলেন গান্ধীজি। আর সেই সঙ্গে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব কর্মপন্থা স্থির করতে শুরু করল। মাষ্টারদার

দলের মধ্যেও আলোচনা হল এবং একটা ব্যাপারে পরিস্কার হলেন সবাই যে বিপ্লবী কর্মপন্থা চালাতে গেলে প্রয়োজন টাকার। তাঁরা স্থির করলেন বিদেশী কোম্পানী আসাম—বেঙ্গল রেলওয়ের টাকা লুঠ করা হবে। ১৯২৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর দুপুরবেলা বিপ্লবীরা নিখুঁত পরিকল্পনায় কয়েক হাজার টাকা লুঠ করলেন। পুলিশ অনুমান করে, এ কাজ মাষ্টারদার দলের। সূর্য্য সেন সহ নেতৃস্থানীয় সকলেই শহর ছেড়ে বাইরে কোন আস্তানায় আশ্রয় নিলেন। যথাসময়ে পুলিশ তাঁদের আশ্রয়স্থলটি ঘিরে ফেলল। সারাদিন পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ চলল। মাষ্টারদার নেতৃত্বে মুষ্টিমেয় বিপ্লবীরা গুলি চালিয়ে পুলিশি অবরোধ ভেঙ্গে ফেললেন এবং কয়েক মাইল দূরে নাগরখানা পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন। এর কিছু পরে বিশাল এক পুলিশি বাহিনী এসে সমস্ত পাহাড়পুর ঘিরে ফেলে। সারাদিন পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময় করে মাষ্টারদা ও অম্বিকা চক্রবর্তী পরাজয় নিশ্চিত জেনে বিষপান করে মৃত্যুবরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁদের হল না, অচৈতন্য অবস্থায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। পরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। যাইহোক অবশেষে এই ঘটনায় অভিযুক্ত সূর্য্য সেন, অনন্ত সিংহ, অম্বিকা চক্রবর্তী শেষ পর্যন্ত প্রমাণাভাবে মুক্তি পান।

পাহাড় তলীর ডাকাতির ঘটনা থেকে দুটো শিক্ষা নেন সূর্য্য সেন। প্রথমতঃ অর্থসংগ্রহের জন্য ডাকাতি বাঞ্ছিত পথ নয়। এতে জনমানসে বিরূপ ধারণা হয়। পুলিশি ঝামেলায় বহু সময় নষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ বিপ্লবীদের আত্মহত্যা করা উচিত নয়। পরবর্তীকালে বিপদের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও মারাত্মক অগ্নিদগ্ধ তারকেশ্বর দস্তিদার, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও হিমাংশু সেনকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোর

সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মাষ্টারদা। গুলিবিদ্ধ বিনোদ দত্তকে বাঁচাতে দাগী চোর গগণ ঘোষের সাহায্য নিতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। অমূল্য বিপ্লবীর জীবন বাঁচানোর চেয়ে বড় সত্য আর কিইবা থাকতে পারে মাষ্টারদার। একমাত্র প্রীতিলতাকে তিনি আত্মহত্যার অনুমতি দিয়ে ছিলেন। কারণ দেশবাসীকে দেখাতে চেয়েছিলেন সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করতে নারীরাও আর পিছিয়ে নেই।

অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হবার পর বাংলাদেশে কর্মকাণ্ড বেড়ে ওঠায় বৃটিশ শাসকরা এক নূতন দমনমূলক আইন করে বিপ্লবী নেতাদের গ্রেপ্তার করতে থাকে। বহু চেষ্টা করেও মাষ্টারদাকে পুলিশ সহজে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এই সময় আড়াই বছর বিপ্লবী সংগঠক গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় তিনি ভ্রমণ করেন। এরপর ১৯২৬ সালে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে মেদিনীপুর জেলে পাঠায় এবং অবশেষে মাষ্টারদা বোম্বাইয়ের রত্নগিরি জেলে স্থানান্তরিত হন। তাঁর স্ত্রী পুষ্পকুন্তলা দেবীর যখন জীবনাবসান ঘটে তখন তিনি রত্নগিরি জেলে। ১৯২৮ সালের শেষের দিকে তিনি মুক্তি পান।

১৯২৮ সালে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসে অধিবেশন বসে সেখানে সুভাষচন্দ্র বসু পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তোলেন। চট্টগ্রাম থেকে সূর্য্যসেন প্রতিনিধি হিসাবে এসেছিলেন কলকাতায় এবং নেতাজীকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর পক্ষে বেশি ভোট সংগ্রহ করতে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এদিকে ১৯২৯ সালে সূর্য্য সেন চট্টগ্রামের জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। উদ্দেশ্য ছিল বেশি করে সমাজসেবা করা। এই সময় সারা

চট্টগ্রামে ব্যায়মাগার ও সঙ্ঘ তৈরার কাজও চালাতে লাগলেন। জনসেবার কাজ দুঃস্থদের পাশে দাড়ানো ইত্যাদি সূর্য্য সেনের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। এসময় সূর্য্য সেনের দাদা একবার এসেছিলেন কিছু সাহায্য চাইতে, কারণ সে সময় তাদের সংসারে চলছিল ভীষণ অভাব অনটন। তিনি সব শুনলেন কিন্তু দাদাকে রিক্তহাতে বিদায় দিলেন। পরক্ষণেই একটি ছেলে এল এবং কংগ্রেস সেক্রেটারীর কাছে কিছু সাহায্যের প্রত্যাশা করল। মাষ্টারদা পকেট থেকে একটা টাকা ধার দিলেন তাকে। কারণ ছেলেটির পরীক্ষার ফি যোগাড় হচ্ছিল না। ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি চট্টগ্রামে কংগ্রেসের এক রাজনৈতিক সম্মেলন হয়। সুভাষ বসু সহ অনেক খ্যাতিনামা নেতৃবৃন্দ আমন্ত্রিত হয়ে চট্টগ্রামে আসেন। এই সময়ে বিরোধী পক্ষের আক্রমণে আহত হন মাষ্টারদা। মাষ্টারদার উপর আক্রমণে ক্ষুব্ধ অনুগামীরা প্রতিশোধ নিতে উদ্ধত হন। মাষ্টারদা শান্তভাবে অনুগামীদের সে পথ থেকে নিবৃত্ত করেন। কারণ পুলিশ সেই সুযোগে বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করবার সুযোগ পেয়ে যাবে।

এরপর মাষ্টারদা বেশিরভাগ কংগ্রেসী নেতা এবং নরমপন্থী বিপ্লবীদের কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন। তিনি চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের নিয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাবার প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করলেন এবং মাষ্টারদা আরো মনে করলেন যে বিদ্রোহের আগুন চট্টগ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে যাবে দাবানলের মত। দলের কর্মীরা অর্থসংগ্রহ করলেন। কিন্তু এই সামান্য অর্থে কতগুলো অস্ত্রকেনা যাবে যদিও সর্বস্ব দিয়ে কর্মীরা তৈয়ারী করলেন।

বিপ্লবীরা সকলে একত্রে হয়ে স্থির করলেন বিদ্রোহের দিনক্ষণ।

মাষ্টারদা সর্বাধিনায়ক। ওয়ার কাউন্সিলে থাকলেন নির্মল সেন, লোকনাথ বল, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ও উপেন ভট্টাচার্য। স্থির হল, পুলিশ আর্মারীর সামনে হেড কোয়ার্টারে থাকবেন সূর্য সেন, সর্বাধিনায়ক পুলিশকে বিভ্রান্ত করার জন্য একটি প্রচারপত্র ছড়ানো হল কংগ্রেসের নেতৃত্বের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মাষ্টারদার নেতৃত্বে ১৯শে এপ্রিল প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ করে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে। এর পরের ইতিহাস আমরা সকলেই জানি ১৮ই এপ্রিল আয়ার্লণ্ডের ইষ্টার বিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত দিনটিতে মাষ্টারদার নেতৃত্বে 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি' সুপরিকল্পিত আঘাত হেনে অস্ত্রাগার দখল করে নিল। জেলার ইউরোপীয়ান শাসকরা শহর ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করল। সাময়িকভাবে বৃটিশ শাসন এখানে ভেঙ্গে পড়ল। বিপুল পরিমাণ অস্ত্র দখল করে দুটি অস্ত্রাগারেই আগুন ধরিয়ে দিলেন বিপ্লবীরা বৃটিশ পতাকা নামিয়ে জাতীয় পতাকা তুলে দিলেন সূর্য্য সেন। শহর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ধুম ষ্টেশনে রেল লাইন উপড়ে দিয়েছেন বিপ্লবী বাহিনী, মাঝে মাঝে লাইনের ফিস প্লেট খুলে দেওয়া হয়েছে, টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হয়েছে। একখানা লুইস গান ছিল ওয়াটার ওয়ার্কসে, হঠাৎ সেটা থেকে গুলি বর্ষণ শুরু করে দিল ইংরেজরা। বিপ্লবীরা সে সময় ভেবেছিলেন হয়তো ইংরেজদের নুতন কোন বাহিনী এসে গেছে। ক্ষুধায় পিপাসায় বিপ্লবী বাহিনী তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রথম নাগারখানা পাহাড়ে এবং পরে জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিল এবং ঘোলাজল আর বুনো কাঁচা আম ছাড়া তাদের কিছু জোটে নি। এভাবে ১৯শে এপ্রিল থেকে ২২শে এপ্রিল এই চার দিন তাঁরা কাটিয়ে দিলেন। এর

মধ্যে ইংরেজ সেনা বাহিনী এসে গেছে। ইষ্টার্ণ রাই ফেলস্ ও সুরমা ভ্যালী রাই ফেলস্ এবং সেইসঙ্গে পুলিশ বাহিনীও এসে গেছে। এসেছে বড় বড় বৃটিশ সেনানায়কের দল। অবসন্ন জনাপঞ্চাশেক বিপ্লবী অদম্য তাদের মনোবল রুখে দিন ইংরেজের বিরাট সৈন্য বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে। প্রতিটি যোদ্ধার পাশে মাষ্টারদা প্রচণ্ড গুলিবর্ষনের মধ্যে প্রত্যেককে উৎসাহ যুগিয়েছে যেন কোনগুলি না ফসকায়। ত্বঘণ্টা ব্যাপী এযুদ্ধে বারোজন বিপ্লবী প্রাণ দিলেন। ইংরেজ সৈন্যদল জালালাবাদ পাহাড়ে উঠতে পারে নি। যাইহোক ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের ইতিহাসে জালালাবাদের এই যুদ্ধ অবিস্মরনীয়। বৃটিশ ভারতে এই যুদ্ধকে হলদিঘাটের যুদ্ধ বলা যায়। সেদিন রাতেই পাহাড় থেকে নেমে আত্মগোপন করলেন। ১৯৩০ সালের ১লা ডিসেম্বর মাষ্টারদা চাঁদপুর ষ্টেশনে বাংলার পুলিশ প্রধান ক্রেগকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। এসময়ে, মাষ্টারদা ও নির্মল সেন কোয়াপাড়া গ্রামে বিপ্লবী কর্মী বিনয় সেনের বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন। মাষ্টারদা রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালী চক্রবর্ত্তীকে অত্যাচারী ক্রেগকে হত্যার নির্দ্দেশ দেন, কিন্তু তাঁরা ভুলক্রমে তারিনী মুখার্জীকে হত্যা করেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বোন সেজে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নেন। আত্মগোপন করে থাকতে থাকতেই ডিনা-মাইট দিয়ে জেল ভেঙ্গে বিপ্লবী মুক্ত করা ও আদালত উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনাও প্রায় সফল করেছিলেন তিনি। তবে শেষ মুহূর্তে পুলিশ টের পেয়ে যায় এবং পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। ১৯৩১ সালের আগষ্ট মাসে মাষ্টারদার নির্দেশে কিশোর হরিপদ সেন জেলার গোয়েন্দা প্রধান আসানুল্লাহকে গুলি করে হত্যা করে। ঐ বছরের আগষ্ট

মাসে ঢাকায় ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নোকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। আত্মগোপন করা অবস্থায় এতগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সশস্ত্র রাজশক্তির চোখ এড়িয়ে তা কার্যকর করা কত কঠিন তা সহজেই অনুমেয়।

১৯৩২ সালের জুন মাস, মাষ্টারদা এবং নির্মল সেন ধলঘাটের সাবিত্রীদেবীর বাড়িতে আত্মগোপন করে রয়েছেন। প্রীতিলতা এসেছেন মাষ্টারদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। হঠাৎ পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলে। শুরু হয় উভয় পক্ষের গুলি বর্ষণ। নির্মল সেনের গুলিতে মারা যান ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ। এরপর তারা ঠিক করেন সামনাসামনি লড়াই চালাবেন নির্মল সেন। এর অর্থ অনিবার্য মৃত্যু। পিছন দিক দিয়ে অবরোধ ভেঙ্গে চলে যাবেন সূর্য্য সেন আর অপূর্ব সেন প্রীতিলতাকে সঙ্গে নিয়ে। যাইহোক এবারও মাষ্টারদাকে ধরা পুলিশের পক্ষে সম্ভব হল না। ধলঘাটের যুদ্ধে মাষ্টারদাকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করলেন বিপ্লবী শহীদ নির্মল সেন। অপূর্ব সেনও গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিলেন। বিপ্লবী নির্মল সেনের মৃত্যুর জবাব দিয়েছিলেন অন্যান্য বিপ্লবীরা ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে। এই আক্রমণ পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন মাষ্টারদা তাঁর স্নেহের বোন প্রীতিলতাকে। প্রীতিলতাকে নিজে সেনানীর বেশে সাজিয়ে দিলেন। বেথুন কলেজের মেধাবী ছাত্রী প্রীতি বি, এ, পরীক্ষায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম এবং সাধারণভাবে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছিলেন। অন্তরের টানে ছুটে এসেছিলেন মাষ্টারদার নাম শুনে। তাই মাষ্টারদার নির্দেশেই ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ সফল করে স্বেচ্ছায় প্রাণ দিলেন প্রীতিলতা। ধলঘাটের সংঘর্ষের পর ধলঘাট থেকে তিন মাইল দূরে গৈরালা গ্রামে বিপ্লবী কর্মী ব্রজেন সেনের বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন মাষ্টারদা। তখন তাঁর মাথার দাম

দশ হাজার টাকা। ব্রজেন সেনের এক আত্মীয় ছিলেন—নাম নেত্র সেন। এ ভদ্রলোক জমিদার হলেও তখন দেনায় তার মাথা আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। টাকার লোভে পুলিশকে খবর দিয়ে এল মাষ্টারদাকে ধরবার জন্য। খবর পেয়ে মিলিটারী ঘিরে ফেলল বিপ্লবী ব্রজেন সেনের বাড়ি। বাড়ির পেছনের জঙ্গল দিয়ে গুলি চালাতে চালাতে অবরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে গেলেন তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত এবং গুলিতে আহত হলেন শান্তি চক্রবর্তী। নিরাপদে বেরিয়ে যাবার একেবারে শেষ মুহূর্তে ধরা পড়লেন মাষ্টারদা। তাঁকে আনা হল মিলিটারী অফিসারের সামনে। মাষ্টারদার ওপর সারা রাত অমানুষিক অত্যাচার চলল। নেত্র সেন বিশ্বাস ঘাতকতার পুরস্কার পেলেন। তবে পৃথিবীতে তার আর থাকা হলনা। এক অজ্ঞাতনামা বিপ্লবী তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে একেবারে পরপারে পাঠিয়ে দিলেন। অবশেষে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশদ্রোহীতা মূলক কাজ কর্মের জন্য বিশেষ ট্রাইবুনেলের বিচারে মাষ্টারদা এবং তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির নির্দেশ দেওয়া হল। সে দিনটি ছিল ১২ই জানুয়ারী ১৯৩৪ সাল। রাত বারোটার পর মাষ্টারদার ফাঁসি হয়। কারাকক্ষের দ্বার খোলামাত্র নিরস্ত্র মাষ্টারদা, ঝাঁপিয়ে পড়লেন মিলিটারীর উপর। শেষমুহূর্তও যুদ্ধ করলেন মাষ্টারদা, আপোষ নয়। তারকেশ্বরও তাই করলেন। সশস্ত্র মিলিটারী প্রচণ্ড আঘাত ও প্রহার চালালো তাদের দুজনের উপর। মাষ্টারদার মুখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। দুজনের রক্তে ভেসে গেল কারাকক্ষ। ওরা সজ্ঞা হারালেন। অচৈতন্য দুটি দেহকে ভীরুর মত ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিল ইংরেজ পশুশক্তি। সেদিন ফাঁসি দেবার মত যথেষ্ট প্রমাণ ইংরেজের হাতে ছিল না। কিন্তু

মাষ্টারদাকে আইনের মর্যাদা রাখতে বাঁচিয়ে রাখার সাহস ছিল না বৃটিশ সরকারের। মাষ্টারদা ফাঁসির ষোলবছর আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আপোষহীন সংগ্রাম করবেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। তাই দেখি ফাঁসির আগের মুহূর্তে তিনি এমন অকুতোভয়ে সংগ্রাম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফাঁসির পূর্বে মাষ্টারদা যে বাণী দিয়ে ছিলেন তা আজও অনুধাবন করা উচিত। তিনি বলেছিলেন, "আদর্শ ও একতা—এই আমার শেষ বাণী। ফাঁসির রজ্জু আমার ওপরে ঝুলছে। মৃত্যু আমার শিয়রে প্রতীক্ষা কোরে আছে। আমার মন ধেয়ে চলেছে অসীমের পানে। এইতো সাধনার সময়। মৃত্যুকে বন্ধুর মত আলিঙ্গন করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার এইতো উপযুক্ত মুহূর্ত। আলোকোজ্জ্বল অতীতের দিনগুলি স্মরণ করার সময় এইটাই। আমার সমস্ত মধুর স্মৃতি, সে তো তোমাদের সকলকে ঘিরে···এই আনন্দময় এই পবিত্র মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য কি রেখে যেতে পারি। রেখে যাবার মত একটি জিনিষই আমার আছে, তা হল আমার স্বপ্ন। একটি মধুর স্বপ্ন স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। কি পবিত্রই না ছিল সেই মুহূর্তটি, যখন আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম। তারপর সারা জীবন প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে সেই স্বপ্ন সত্যে পরিণত করতে জগতের সমস্ত কিছু ভুলে ক্লান্তিহীন ভাবে আমি ছুটে চলেছি। জানিনা আরব্ধ কাজ সফল করার পথে কতটা এগিয়ে যেতে পারলাম। জানিনা, সেই পথের কোনখানে এসে আজ আমাকে থেমে যেতে বাধ্য করা হল। যদি লক্ষ্যে পৌঁছবার আগে মৃত্যুর শীতল হাত তোমাকেও স্পর্শ করে তবে আরব্ধ কাজের দায়ীত্ব তোমার উত্তর সূরীদের হাতে অর্পণ করো, যেমন আমি করে গেলাম। এগিয়ে চল সামনে, এগিয়ে চল, পিছিয়ে পড়োনা।

মুহূর্তের জন্যও না। উনিশশো তিরিশের আঠেরই এপ্রিল, ইষ্টার বিদ্রোহের দিন। সেদিনের চট্টগ্রামকে তোমরা ভুলো না। জালালাবাদ জুলঠা, চন্দননগর আর ধলঘাটের সংগ্রামের স্মৃতি তোমরা চির অম্লান করে রেখো। ভারতের স্বাধীনতার বেদীমূলে যে সব শহীদ আত্মবলিদান করেছেন তাঁদের নাম রক্তাক্ষরে লিখে রেখো তোমাদের অন্তরের অন্তস্থলে।" বিপ্লবী মাষ্টারদার শেষ কথা গুলো থেকেই মনে হয়, আমাদের তরুণ সমাজের সামনে এমন একজন দেশপ্রেমিককে তুলে ধরার মত পূণ্যের কাজ আর নেই।

মাষ্টারদা ভারতের আকাশে বৃটিশের বিরুদ্ধে যে বজ্রপাত ঘটিয়েছিলেন তার প্রভাব পরবর্তী ধাপের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল। আমরা যেন মনে রাখি এই মাষ্টারদা অত্যন্ত গরীব ঘরের ছেলে ছিলেন। সহজাত নেতৃত্বের অধিকারী মাষ্টারদা ২৫শে অক্টোবর ১৮৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল কলেজে শিক্ষালাভের সময়ই তাঁর অন্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ উপ্ত হয়েছিল। মাষ্টারদার জীবন মানেই সংগ্রাম। মাষ্টারদা জানতেন চট্টগ্রাম মুক্ত করে খুব বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না, কিন্তু তাঁদের আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে এমন একটা দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়া যাবে, তাতে সারাভারত উদ্দীপ্ত হবে এবং অচিরেই বৃটিশ শাসনের অবসান হবে। শিক্ষকতার জীবনে ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেমের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিলেন। প্রীতিলতা কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন প্রাণদণ্ডে আজ্ঞাপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে। এসময় মাষ্টারদার সঙ্গে দেখা হল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মাষ্টারদার সংগ্রামে সামিল হবার অনুপ্রেরণা অনুভব করলেন। এই প্রীতিলতার মৃত্যুর পর মাষ্টারদা বলেছিলেন যে, তিনি

যেন চারিদিকে কেবল শ্মশান দেখছেন, কারণ একে একে বিপ্লবীরা চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই শোকের মধ্যেও আশার আলো দেখতে পেয়েছিলেন। সেটা হচ্ছে শ্মশানের উপর স্বাধীনতার স্মৃতিসৌধ। অবশেষে তিনি নিজেই ১৯৩৪ সালে ১২ই জানুয়ারী ফাঁসির মঞ্চে মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে জীবনের জয় গান গেয়ে গেলেন। তিনি আমৃত্যু অখণ্ড ভারত মাতার ছবিকল্পনা করেছিলেন! তাই আজ তরুণ সমাজের কাছে আমাদের প্রত্যাশা মাষ্টারদার স্বপ্ন অখণ্ড ভারত আগামী দিনে তারা আমাদের উপহার দিতে পারবেন। আর বিচ্ছিন্নতা নয়, এখন চাই একতা। মাষ্টারদার জীবনই তাঁর বাণী।

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাস ও তাঁর আত্মবলিদান

বৃটিশ শাসকেরা আমাদের দেশের বিপ্লববাদী যুবকদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিত। অথচ তাদের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক বিরাট ভূমিকা ছিল। আজ একথা সুস্পষ্ট যে, বিপ্লববাদী যুবকদের কার্য-কলাপের প্রাণকেন্দ্র ছিল অবিভক্ত বাংলাদেশ। একথা সর্বজনবিদিত যে বিনা বিচারে আটক আইন প্রয়োগ করে বিপ্লববাদী যুবকদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টার ত্রুটি তারা করেনি। বৃটিশ শাসকেরা আশা করেছিল যে বন্দী করে রাখলেই বিপ্লববাদী যুবকেরা হতাশ হয়ে বিপ্লববাদের পথ ছেড়ে দেবে। তাদের আশা দুরাশায় পর্যবসিত হয়েছিল।

বর্তমান শতাব্দীর উষালগ্নে বাংলার যে সব তরুণেরা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন্দ্রনাথ দাসের ঐতিহাসিক আত্মদানের কথা আমরা গর্বভরে স্মরণ করি। ১৯০৪ সালের ২৭শে অক্টোবর এই বিপ্লবী কলকাতার ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১০ সালে ভবানীপুর মিত্র ইন্‌স্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে কংগ্রেসের সদস্য হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২১ সালে পশ্চিমবঙ্গে বন্যার্তদের সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে যান এবং ১৯২৩ সনে বিপ্লবী শচীন সান্যালের ভবানীপুরের ঘাঁটিতে যোগ দেন। ইনি পরে ১৯২৪ সালে ভবানীপুরে তরুণ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময়ে তাঁকে বৃটিশ সরকার গ্রেপ্তার করে ঢাকা জেলে পাঠিয়ে দেয়। এখানে জেল কর্তৃপক্ষের অন্যায়

আচরণে ক্ষুব্ধ যতীন দাস ২৩ দিন অনশন করেন। সে সময় রাজনৈতিক বন্দীদের কঠোর শ্রম করিয়ে নেওয়া হত। অনেক সময় ডাকাতদের সঙ্গে রাখা হত। বইপত্র দেবার পরিবর্তে যতরকম অমর্যাদাকর ব্যবহার করা হত এবং নিকৃষ্ট খাদ্য তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল। এদিকে সেন্ট্রাল এ্যাসেম্বলী বোমা মামলার আসামী হিসাবে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তর যাবৎজীবন দীপান্তর দণ্ড দেওয়া হল ১৯২৯ সালের ১২ই জুনে। ঠিক এ সময় দেখা গেল বিভিন্ন প্রদেশ থেকে রাজনৈতিক যুবকদের ধরে এনে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করা হয়। বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগৎ সিং তখন জেলে আমরণ অনশন করছিলেন। অন্যদিকে ১৪ই জুন ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আসামী যতীন দাসকে ও লাহোর জেলে আনা হল।

১৩ই জুলাই লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় সকল আসামীকে আদালতে আনাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল, বটুকেশ্বর দত্তকে ষ্ট্রেচারে করে আনা হয়। কারণ তিনি খাদ্য গ্রহণ না করায় অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। এর ফলে কর্তৃপক্ষের মতে জেল আইন ভাঙ্গা হয়েছিল। ফলে তাঁকে সাজা হিসাবে পায়ে বেড়ী দেওয়া হয়েছিল। অগত্যা ষ্ট্রেচার ছাড়া আনবার আর কোন উপায় ছিল না। এদিকে সব রাজবন্দীরা আদালতে প্রবেশ করবার পর ধ্বনি দিতে শুরু করল "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্" "বিপ্লবী দীর্ঘজীবী হোক" ইত্যাদি।

যতীন দাসকে গ্রেপ্তার করার আগে কেস সাজানো হয়েছিল তিনি লাহোর লরেন্স গার্ডেনে বোমা খুলে বার করেছেন এবং জনৈক পিওনকে হত্যা করেছেন। এই অজুহাতেই তাঁকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

এদিকে সরকার ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তকে মেঝেতে ফেলে হাত পা চেপে ধরে জোর করে খাওয়াবার জন্য আসুরিক চেষ্টা চালাতে লাগল। কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হয়ে পদ্ধতি পরিবর্তন করল। এই যখন অবস্থা যতীন দাস ১৬ই জুন অনশন আরম্ভ করেন। ২রা জুলাই তাঁর অবস্থার অবনতি হয়। এসমস্ত কথা তখন প্রচার হয়েছিল তা সঠিক নয়। কেননা যতীন দাস প্রাণ হারান তেষট্টি দিনের মাথায়, তা যদি হয় তবে তেষট্টি দিনের তের দিন বাদ দিলে পঞ্চাশ থাকে। আগষ্ট মাস একত্রিশ দিনে। এই একত্রিশ দিন বাদ দিলে জুলাই মাসের উনিশ দিন নিতে হয়, তবে তেষট্টি হয়। তাহলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ১৩ই জুলাই যতীন দাস অনশন শুরু করেছিলেন, এর মানে দাঁড়ায় বটুকেশ্বর দত্তকে সেদিন ষ্ট্রেচারে করে আদালতে আনা হয়েছিল। একথা ঠিক যতীন দাস ১৬ই জুন অনশন করেছেন, সেটা ছিল সহানুভূতি সূচক অনশন। এছাড়া তিনি সবে লাহোর জেলে এসেছেন। সুতরাং ১৩ই জুলাই এর আগে যিনি আমরণ অনশন করেননি—২রা জুলাই তার অবস্থার অবনতি হবে কি করে?

এবার দেখা যাক কর্তৃপক্ষের আচরণকে বিপ্লবীরা কতটা এঁটে উঠতে পেরেছিলেন? তবে একথা বলা যায় বিপ্লবীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারা তখন ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। এরা অমানবিক ভাবে জল বন্ধ করে দিল। এসম্বন্ধে ভগৎ সিং সহকর্মী অজয় ঘোষকে বলেছেন, "একদিন পর পিপাসা চরমে উঠল।" বলাবাহুল্য এই অজয় ঘোষ পরে অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী হয়েছিলেন। "জলে রাখার বাধা কলসীটার দিকে জল আছে মনে করে

বার বার যেতে লাগলাম আর ফিরে আসতে লাগলাম। জলের কলসীতে জলের পরিবর্তে দুধ ছিল।

এদিকে সারাভারতে যত রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন সর্বত্র তাঁদের সহানুভূতি সূচক অনশন শুরু হয়ে গেল। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দীরাও অনশন আরম্ভ করলেন। দেশময় শুরু হয়ে গেল বিক্ষোভ। বিক্ষোভে বিক্ষোভে বৃটিশ সরকার অসহায় বোধ করে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষকে সমস্ত বিষয় জানান। তারপর ১৩ই জুন সরকার জানালো মেডিকেল গ্রাউণ্ডে বিশেষ খাদ্য দেওয়া যেতে পারে, বিপ্লবীরা এই সুবিধা নেবার পরিবর্তে তা প্রত্যাখান করলেন।

যতীন দাসের বাবা বঙ্কিমচন্দ্র দাস ছেলেকে বিজ্ঞান পড়িয়েছিলেন। সে সময় তিনি চমৎকার ভাবে বোমা তৈরী করতে শিখেছেন। সেই সূত্রেই চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং এবং অজয় ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হয়। লাহোরে লরেন্স গার্ডেন বোমা নিক্ষেপের পর সহকর্মীদের যে দাবী, সেই দাবী নিয়ে শুরু করেছিলেন অনশন। নাক দিয়ে জবরদস্তি খাওয়াতে গেলে যতীনদাস বারে বারে প্রতিরোধ করতে লাগলেন। এর ফলে তিনি প্রচণ্ড আঘাত পেতে থাকেন এবং ক্রমশঃ দুর্বলও হয়ে পড়তে লাগলেন। ২৪শে জুলাই তাঁর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হতে আরম্ভ করল। এ সময় তাঁর নাড়ীর গতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে এলো এবং তাঁকে জেল হাসপাতালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ২৬শে জুলাই তাঁর জ্বর উঠল ১০৩ ডিগ্রীতে। ঐ দিনই কংগ্রেসের এলাহাবাদের অধিবেশনে সরকারের এই বর্বরতামূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। ৩১শে জুলাই যতীন দাসের অবস্থা আরোও খারাপ হয়ে গেল। ৬ই আগষ্ট তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। যতীন দাস তারপর অবস্থাটা সামলে

উঠলেন। অবশেষে ২৩শে আগষ্ট রাত্রে ছটফট করে তাঁর কাটলো। পরের দিন মস্তিষ্কের রক্তাল্পতা এবং তারপর দেখা গেল বাঁ পা-টা নাড়া যাচ্ছে না। ৩০শে আগষ্ট ওষুধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা গেল হেঁচ্‌কি উঠছে। ইতিমধ্যে পাঞ্জাব জেল এনকোয়ারি কমিটি ১৮ই আগষ্ট ঘোষণামত দণ্ডপ্রাপ্ত বিচারাধীন আসামীদের জন্য কিভাবে জেল আইন বদলানো যায় তা তদন্ত করতে আসেন। সেই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯২৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর বিকাল ৫ টায় বন্দীরা অনশন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কিন্তু যতীন দাসের পক্ষে এই ঘোষণা অবান্তর। তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। ১লা সেপ্টেম্বর তাঁর কোমরের বাঁ দিকটা সম্পূর্ণ অবশ হয়ে পড়ল এবং চোখ বন্ধ হয়ে গেল। এতেও তাঁর প্রাণ-হানি হয় নি। ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রচণ্ড জ্বর হয়। ৮ই সেপ্টেম্বর সকাল থেকে তাঁর পা একেবারে অসাড় হয়ে গেল। ১০ই সেপ্টেম্বর তাঁর অনশনের ৬০ দিন পূর্ণ হল। এ সময় একদিকে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় হয়ে গেল। দেখে বোঝা যাচ্ছিল না তিনি মৃত কি জীবিত। ১১ই সেপ্টেম্বর হোম মেমবার সেণ্ট্রাল এ্যাসেম্বলীতে ঘোষণা করলেন যতীন দাসের অবস্থা সংকট জনক। ১২ই সেপ্টেম্বর যতীন দাস রক্তবমি করতে লাগলেন। রাত তখন ১টা বেজে ৫ মিনিট সময়টা ইংরাজী মতে ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ যতীন দাস আত্মদান করলেন। তাঁর মহান আত্মদান ইতিহাসের এক যুগ-সন্দিক্ষণ সৃষ্টি করল।

এদিকে যতীন দাসের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠল সারা ভারত। কেন্দ্রীয় এ্যাসেম্বলীতে মতিলাল নেহেরু

একটি মুলতুবী প্রস্তাব তুললেন "That the Assembly should adjourn to discuss the death of Jatin Das and the released matters" প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য উঠে দাঁড়ালেন। মতিলাল বললেন, "আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট নীরোর চেয়েও ভালো কাজ করেছেন। যখন বন্দীরা ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছেন তাঁরা শুধু তা লক্ষ্য করেছেন।" মদনমোহন মালব্য বললেন "সম্ভ্রান্ত যুব সম্প্রদায় দেশের মুক্তি কামনায় উৎসর্গীকৃত কতপ্রাণ তাদের প্রতি সাড়া দিতে পারেনি এই সরকার।" অমরনাথ দত্ত বললেন—"এই সরকার যতীন দাসকে খুন করেছে।" সেদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সভ্যসমাজের মুখোস খুলে গিয়েছিল। তাদেরই কেন্দ্রীয় এ্যাসেম্বলীতে যতীন দাসের মৃত্যু উপলক্ষ্যে মুলতুবী প্রস্তাব ৫৫-৪৭ ভোটে গৃহীত হয়েছিল। আমার মনে হয় তাদের লজ্জা থাকলে সেদিন গভর্ণমেণ্টকে ভেঙ্গে দিয়ে অন্যরকম ব্যবস্থা করত। কিন্তু তা করেনি।

এরপর লাহোর থেকে কলকাতায় যতীন দাসের মৃতদেহ নিয়ে আসা হল। পথে বিভিন্ন ষ্টেশনে যতীন দাসের মরদেহের উপর পুষ্পবৃষ্টি হয়েছে। কানপুর ষ্টেশনে স্বয়ং জহরলাল নেহেরু অবনত মস্তকে যতীন দাসের মরদেহকে সম্মান দেখালেন। এরপূর্বে লাহোরে সর্বস্তরের জনসাধারণ পথে বেড়িয়ে পড়েছিলেন। পাঞ্জাবীরা উচ্চ মস্তকে রাস্তায় মৌনমিছিলে যোগ দিয়েছিল। যখন কোলকাতায় মরদেহ পৌছল তখন দেখা গেল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেই মৃতদেহ গ্রহণ করলেন। কলকাতায় তৎকালীন সময়ে এতবড় শোকমিছিল আর দেখা যায় নি। রৌদ্রদগ্ধ কলকাতায় নগ্নপদে হাজার হাজার মানুষ চলেছে। পথের দুপাশের বাড়ির ছাদ থেকে ফুল আর

জল ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, রাস্তায় গরমে পা পুড়ে যাচ্ছে তবু মানুষের ভ্রুক্ষেপ নেই। চারিদিক থেকে শুধু ধ্বনি শোনা যাচ্ছে "যতীন দাস কী জয়' বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্।" আর ঠিক এই সময়ে আয়ারল্যাণ্ডের মাটীতে কক্ শহরে লর্ড মেয়র টেরোস ম্যাক-সুইনী ঠিক এভাবেই আয়াল্যাণ্ডের মুক্তিযজ্ঞে অনশন করে আত্মদান করেছিলেন এবং এভাবে মৃত্যুবরণ করে ধন্য হয়েছেন।

আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের অর্দ্ধশতাব্দীর সন্নিকটবর্ত্তী হয়ে যখন বিপ্লবী যতীন দাসকে পরিচয় করাতে হয় তখন লজ্জায় আমাদের মাথা নীচু হয়ে আসে। যতীন দাসের চিতাভস্ম নেতাজী সুভাষচন্দ্র কপালে ধারণ করে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, বৃটিশকে তিনি এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করবেন। যতীন দাসের পিতা বঙ্কিম দাস যতীন দাসের মৃত্যুর পর বলেছিলেন, তাঁর পুত্র আত্মদান করে যে সমস্ত লোক এই বাংলার মাটিতে বিশ্বাস ঘাতকতা করে আমাদের দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়ে ছিল, তারই প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন। তাই যখন কলকাতায় যতীন দাস পার্কের পাশ দিয়ে যাই, তখন যতীন দাসের মর্মর মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে ভাবি—এইতো সেই যতীন দাস, যিনি দধিচীর মত আত্মদান করে গেছেন আমাদেরই মঙ্গলের জন্য। আমরা আজ আত্মবিস্মৃত জাতি, এবং এ জাতিকে পথ দেখাতে পারে যতীন দাসের মত মৃত্যুঞ্জয়ী বীরেরা। তাই ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর দিনটি আমাদের শপথ গ্রহণ করার দিন, কারণ এদিন আমাদের মহান বিপ্লবী যতীন দাস ৬৩ দিন অনশন করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর স্বাধীনতাপ্রেমী মানুষের কাছে যতীন দাস অমর হয়ে থাকবেন।

বিপ্লবী অনুজাচরণ সেন—মুক্তিযজ্ঞে উৎসর্গীকৃত একটি নাম

একএক সময় ভাবি, এ আমরা কোন যুগে এসে পৌঁছলাম। আমাদের তরুণ সমাজকে পথ দেখাবে কে? আমাদের কি দেবার মত কিছু নেই? আবার নিজেই নিজের উত্তর পেয়ে যাই। নিশ্চয়ই আছে। আমাদের দেশের মুক্তিসংগ্রামে একদিন যে তরুণদল হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছিলেন, তাঁরাই আমাদের পথহারা তরুণ তরুণীদের পথ বলে দেবেন। এখন যাঁর কথা বলছি, তিনি ফাঁসিতে জীবন দেন নি সত্য, তবে দুর্ঘটনায় তাঁর যদি মৃত্যু না হোত, তবে ফাঁসিতেই তাঁকে ঝুলতে হোত।

অনুজাচরণ সেন ১৯০৫ সালে খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম বিমলাচরণ সেন। ইনি ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলে যোগ দেন। জীবনের প্রারম্ভে ছাত্রাবস্থায় বিভিন্ন সেবাকর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে তিনি আত্মীয়তা স্থাপন করেন। সেদিনের অন্যান্য বিপ্লবীদের মত ব্যায়ামচর্চা, পঠন ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি বিপ্লব মন্ত্রে নিজেকে দীক্ষিত করেন। অনেক সময় দেখা গেছে ভয়ঙ্কর কলেরা বসন্ত, মহামারীর সময় প্রাণঢালা সেবা দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের মানুষের উপকার করে চলেছেন অনুজা। মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে যেভাবে বিপ্লবীদলের প্রসার ঘটাতে তিনি সক্ষম হচ্ছিলেন, সেরকম খুব কমই দেখা যায়। বিশেষ করে কলকাতায় বিপ্লব প্রস্তুতির ব্যাপারে তিনি যেভাবে প্রয়াস চালিয়েছেন, তা খুব অল্প সময়েই

তৎকালীন নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর দলের নেতাদের নির্দেশে রংপুরের গাইবাঁধা গ্রামে গিয়ে দুবছর দলের সংগঠনের কাজ তিনি করেন। এরপর কলকাতায় ফিরে আসেন। এসময় দলের একজন অন্যতম নেতা বিপ্লবী শৈলেশ্বর বসু টি. বি. রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর সহকর্মী বন্ধু বিপ্লবী দীনেশ মজুমদারের সঙ্গে শৈলেশবাবুর সেবা করেন। সেযুগে টি. বি. প্রাণঘাতি ছোঁয়াচে রোগ বলে লোকে দূরে সরে থাকত। কিন্তু অনুজা এবং দীনেশ যেভাবে দিবারাত্র শৈলেশ বাবুর সেবা করেছেন তা কেবলমাত্র ডিরোজিও কে কলেরা রোগে আক্রান্ত হবার পর তার ছাত্ররা যেভাবে সেবা করেছিলেন, তা মনে করিয়ে দেয়।

১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ ও জালালাবাদ যুদ্ধের সময় যুবকের দল যখন প্রাণ উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার টেগার্ট কে নিধনের নির্দেশ পেলেন অনুজাচরণ, দীনেশ মজুমদার অতুল সেন ও শৈলেন নিয়োগী। ২৪শে আগষ্ট ১৯৩০ সালে যথাসময়ে টেগার্টের গাড়িটি ডালহৌসী স্কোয়ারে আসার সঙ্গে সঙ্গে দীনেশ মজুমদার বোমা ছোঁড়েন, তৎক্ষণাৎ গাড়িটি থেমে যায়। আর সঠিক সময়েই বিপরীত দিক থেকে দ্বিতীয় বোমাটি ছোঁড়েন অনুজাচরণ। কিন্তু দুর্ভাগ্য এমনই, বোমাটি তাঁর কাছেই ফেটে যায় এবং ভীষণভাবে আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন অনুজাচরণ। অনেকে যারা সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাদের কথায় জানা যায় অনুজার শহীদ হবার আগের মুহূর্তেও হাসিটি মিলিয়ে যায় নি। হয়তো তিনি শেষ মুহূর্তে জেনে গেছেন তাঁর বোমাতেই বিপ্লবের শত্রু টেগার্ট পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। যাই হোক অনুজার সফলতা আসুক আর নাই আসুক তাঁর কাজের প্রভাব সেদিন সারা

বাংলায় বিপ্লবীদের মধ্যে যে অনুরণন জাগিয়েছিল, তা ভোলবার নয়। দেশপ্রেমিক অনূজা মাত্র ২৫ বছর বয়সেই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবনের জয়গান করে গেছেন। আজ যখন আমরা যশলোভে খ্যাতিলাভে পরমবন্ধু, আত্মীয় পরিজন সবাইকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করিনা, তখন পূর্ণ যৌবন ও ভবিষ্যতের প্রাণ প্রাচুর্যতাকে ছেড়ে দেশের জন্য মৃত্যুবরণ করতে অনূজাচরণের এতটুকু কষ্ট দেখা গেল না।

আমরা মনে করি অনূজারা মরতে পারে না। আমরা আবার জনগণ-তান্ত্রিক বিপ্লবের আহ্বানে অনূজাচরণদের দেখতে পাবো। সাম্য ও সত্যিকারের গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করবার জন্য অনূজার মত ছেলেরা আবার আসবে। তাই শুরুতে যে কথা বলেছিলাম—আদর্শের জন্য আমাদের অন্য কোথাও যাবার দরকার হবে না। ভারতের মাটিতে যে নূতন যৌবন আসছে, তাতে আজকে যারা তরুণ তারা অংশ গ্রহণ করবে, এ বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা আমাদের আছে। আর তা না থাকলে আমরা কি নিয়ে বেঁচে থাকব। আমাদের জীবন সায়াহ্নে বিশেষ কিছু দেবার নেই।

বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা

বাংলাদেশের বহু শহীদ তাঁদের জীবন আহুতি দিয়েছেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহাযজ্ঞে। একথা বলতে আমাদের গর্ব ও সমভাবেই রোমাঞ্চ হয়, যখন দেখি এই বাংলার মুক্তিপাগল দামাল ছেলেরা ফাঁসির রজ্জুকে চুম্বন করে মৃত্যুর বাসর শয্যায় যাত্রা করেছেন অকুতোভয়ে। এখন যাঁর কথা বলতে বসেছি তিনি আজ প্রায় অপরিচিত আমাদের তরুণদের কাছে। এভাবে দেখা যায়, অগণিত বিস্মৃতপ্রায় বিপ্লবীদের সঙ্গে আমাদের তরুণদের পরিচিত করাবার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করিনি এতকাল। কারণ এদেশে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কথা 'যতখানি পরিচিতি লাভ করেছে বিপ্লববাদী আন্দোলনের কথা আমরা অনেকেই ইচ্ছা করে ততখানি প্রচার করিনি এবং তা করিনি আমাদের শ্রেণী স্বার্থেই। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি তা বেয়াল্লিশ বছর অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু গোপীনাথের প্রতি কি আমরা যোগ্য মর্যাদা দেখিয়েছি ! এ প্রশ্ন আমরা দেশনেতাদের করতে পারি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির তেইশ বছর পূর্বে গোপীনাথের জীবনদীপ নির্বাপিত করেছিল নিষ্ঠুর ইংরেজ।

যাইহোক যাঁর কথা বলছিলাম সেই গোপীনাথ সাহা ১৯০৬ সালে হুগলীজেলার শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বিজয়কৃষ্ণ সাহা। গোপীনাথ অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিদ্যালয় ত্যাগ করত বাধ্য হয়েছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে হুগলী বিদ্যামন্দির, কলিকাতা সরস্বতী লাইব্রেরী ও সরস্বতী প্রেস, দৌলতপুর সত্যাশ্রম, বরিশাল শঙ্করমঠ, উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি বিপ্লবী সংগঠনের বিভিন্ন নেতার সঙ্গে কাজ করেছেন। এসময় অত্যাচারী কলকাতার পুলিশ কমিশনার

চার্লস টেগার্ট বিপ্লবীদের নিকট যেন হয়ে উঠেছিলেন সাক্ষাৎ দানব। একদিন গোপীনাথ প্রস্তুতি নিলেন চার্লস টেগার্টকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার। সালটা ছিল ১৯২৪ এবং এসময়ই গোপীনাথ পুরোপুরি ঢুকে পড়েন ঘরছাড়া লক্ষ্মীছাড়াদের বিপ্লবী আন্দোলনে। এদিকে ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসে গান্ধীজীর সাথে মতবিরোধের ফলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সারা দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেশবন্ধু বাংলার বিপ্লবী যুবকদের প্রতি সর্বাপেক্ষা সহানুভূতিশীল নেতা।

১২ই জানুয়ারী ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু বাড়িতে অনেক কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কোমরে রিভলবার নিয়ে গোপীনাথ গেলেন দেশবন্ধুর কাছে আশীর্বাদ চাইতে। গোপীনাথ দেশবন্ধুকে বললেন, 'তাহলে আশীর্বাদ করুণ—আমি যাই।' দেশবন্ধু তখন এমন তন্ময় হয়ে কাগজপত্র পড়ছিলেন, যেন শুনতেই পেলেন না। গোপীনাথ বার বার দেশবন্ধুকে বললেন, 'তাহলে আমি যাই'। গোপীনাথ এককথাই বলে চলেছেন। দেশবন্ধু গোপীনাথকে ভালভাবেই জানতেন, তিনি তাকে Fire brand ছেলে বলতেন। হঠাৎ কাগজ থেকে মুখ তুলে বললেন, 'কোথায় যাবি? গোপীনাথ উত্তরে বললেন, সেই যে বলেছিলাম'। গোপীনাথ কি বলেছিলেন, কখন বলেছিলেন, কিছুই দেশবন্ধুর তখন মনে নেই। কাজের সময় বিরক্ত করতে দেখে দেশবন্ধু বললেন, যা, যেখানে যাবি যা'। গোপীনাথ আনন্দে আত্মহারা হয়ে আবেগে দেশবন্ধুর পায়ের ধুলো নিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন পথে। দেশবন্ধু তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন, একি তাঁর কম আনন্দ। গোপীনাথ চলে গেলেন সেই চৌরঙ্গী আর পার্ক ষ্ট্রীটের জংশনে। টেগার্ট এপথ দিয়ে যান। শক্তকরে ধরলেন পিস্তল। এবার অভীষ্ট মুহূর্ত সমাগত

হল। গর্জন করে উঠল পিস্তল, ঢলে পড়ল সাহেব গাড়ীর মধ্যে। গোপীনাথ আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভাবলেন টেগার্ট গেছে।

অবশেষে গ্রেপ্তার হয়ে যখন দেখলেন টেগার্টই তাঁকে অভ্যর্থনা করছেন, তখন তাঁর আফশোষের সীমা রইল না। তাঁর গুলিতে মারা গিয়েছিলেন কিলবার্ণ কোম্পানীর অফিসার আর্নেষ্ট ডে। এতে তিনি দুঃখিত হয়েছেন। খুব দ্রুত বিচারে গোপীনাথের ফাঁসির হুকুম হলো। অবশেষে ১লা মার্চ ১৯২৪ সালে গোপীনাথের ফাঁসি হয়ে গেল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ফাঁসির আদেশকে গোপীনাথ সাদরে গ্রহণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু, ভারতের ঘরে ঘরে রক্তবীজের মত স্বাধীনতা সংগ্রামী সৃষ্টি করুক। গোপীনাথের মৃত্যুর পূর্বের সবকথা জানা যায়নি। তবে Institute of historical studies থেকে যে Dictionary of National Biography প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে ইংরাজী তর্জমা কিছুটা তুলে দেওয়া হল, মাকে ফাঁসির কুঠুরি থেকে গোপীনাথ এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, "That you are my mother. This is your glory. There is nothing to bewail. Let every mother give birth to a courageous son of your type and this illumine the face of mother India."

গোপীনাথের ফাঁসিতে দেশবন্ধু ভীষণভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি নিজে শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন ২৭শে জুন ১৯২৪ সনে। কিন্তু সেই শোকপ্রস্তাব পরাজিত হয় ৭৮—৭০ ভোটে। তারচেয়ে লজ্জার কথা আর কিই বা থাকতে পারে। কিন্তু শহীদ গোপীনাথ আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন চিরদিন।

বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার ও তাঁর আত্মত্যাগ

রবীন্দ্রনাথের এক বেয়ারা ছিল, তার নাম গুপী। একবার সে পুরীধাম তীর্থে গিয়ে জগন্নাথদেবকে কোন কোন ফল উৎসর্গ করবে এই নিয়ে বিষম ভাবনায় পড়ে গেল। শেষকালে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল বিলিতি বেগুনের কথা। জগন্নাথদেবকে সে উৎসর্গ করে এলো বিলিতি বেগুন, শেষ পর্যন্ত এসম্বন্ধে তার মনে আর কোন পরিতাপ রইল না। রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীর উল্লেখ করে তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বললেন, স্বরাজ সাধনার নাম করে তেত্রিশ কোটি লোককে চরকা কাটতে বলা আর জগন্নাথদেবকে বিলিতি বেগুন দেওয়া একই কথা। অবশ্য এই প্রসঙ্গ ছেদ টানতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "আশাকরি ভারতবর্ষে তেত্রিশ কোটি গুপী নেই।" কিন্তু স্বাধীনতার তেতাল্লিশ বছর পর রবীন্দ্রনাথ যদি বেঁচে থাকতেন, তিনি দেখতেন তেত্রিশ কোটি না হোক ভারতের সত্তর কোটি মানুষের সংসদীয় রাজনীতির জগতে গুপীদের অভাব নেই। যারা গণতন্ত্রের পূজা বেদীতে বিলিতি বেগুনের জায়গায় একটি করে ভোট উৎসর্গ করেই মনে করেন বিপ্লবের কাজ সমাধান হয়ে গেল। তাঁরা ইচ্ছে করেই বুঝেও বোঝেন না ভোটের মধ্যে দিয়ে মন্ত্রী বদল হতে পারে মানুষের সামাজিক রূপান্তর ঘটানো কখনও সম্ভব নয়। কিছু সুবিধা বাদী লোকের সুযোগ সুবিধা হলে হতেও পারে, তবে সত্তর কোটি ভারতবাসীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন এতে সম্ভব হবে না।

বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে বলতেই হয়, আজকের দিনের বিপ্লবের ধ্বজাধারীদের মত সহজ উপায়ে বিপ্লবের কাজ সমাধান করা যায় তা তিনি বিশ্বাস করতেন না। সেই সঙ্গে সবমানুষ শিক্ষিত হবে, গুণ্ডা, পুলিশ মিলিটারী সব সাধারণ মানুষের পাশে চলে আসবে এবং অনায়াসে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হবে এ বিশ্বাসও করা এজাতীয় মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

১৯৩০ সালের ২৫শে আগষ্ট বিপ্লবীরা ঠিক করেছিলেন যে কিড্ ষ্ট্রীটের বাড়ি থেকে ডাক সাইটে পুলিশ অফিসার টেগার্ট যখন লাল বাজারের পথে ডালহৌসিতে পৌঁছাবেন সেই সময়টা জেনে নিয়ে তার উপর বোমা ফেলা হবে। বিপ্লবী অনুজা সেনগুপ্ত যথাসময়ে বোমা ফেলল। কিন্তু টেগার্টের গাড়িতে লেগে বোমাটা রাস্তায় পড়ে বিকট আওয়াজে বিদীর্ণ হল। অনুজা সেখানেই আহত হয়ে ঢলে পড়লেন মাটির কোলে। সেখানে দীনেশ মজুমদার ছিলেন এবং তিনি আহত অবস্থায় পালাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। এ ঘটনা বহু পুরানো বিপ্লবীদের কাছে শুনেছি। এ ব্যাপারে ধরা পড়েন ডঃ ভূপাল বসু ও নারায়ণ রায়। ডালহৌসী বোমা মামলায় এদের সবারই যাবজীবন কারাদণ্ড হয়। দীনেশবাবুকে পাঠানো হয়েছিল পাথর দিয়ে গাঁথা মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে। কিন্তু শোনা গেল ১৯৩২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী দীনেশবাবু এবং তাঁর কয়েকজন সাথী জেলের প্রাচীর ডিঙিয়ে পালিয়ে গেছেন। এই জেল পালানো নিয়ে অনেকে অনেকে রকম বলেছেন। কেউ বলেছেন তিনি মধ্য রাত্রে পালিয়েছেন। কালীচরণ ঘোষ লিখেছেন—যে ১৯৩২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী সকালের মধ্যে দীনেশ মজুমদার পালিয়েছিলেন। তবে একথা সঠিক যে

ফেব্রুয়ারীর ৮ তারিখের মধ্যে ব্যাপারটা সকলের কাছে জানাজানি হয়েছিল। কারণ এসময়েই জেলের কয়েদিদের গোনা শুরু হয়। গভীর রাত্রে জেলখানায় গোনাগুণতির কোন অবকাশ থাকে না। তবে একটি কথা বলা যায় যে দীনেশবাবুরা একসঙ্গে তিনজন পালিয়েছেন বলে যা বলা হয়েছে, ব্যাপারটা আপাত দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হয় না। তাঁরা থাকতেন সেলে। সেল থেকে তিনজন একত্রে পালানো খুব অসুবিধাজনক। তাছাড়া অন্যের সাহায্য পাওয়াও খুব কঠিন। সেজন্য কিছুদিন আগে ওঁরা এ্যাসোসিয়েশন ওয়ার্ডে আসেন। সেখানে অনেক লোক থাকে। শচীন করগুপ্ত এ সম্পর্কে লিখেছেন—"যাতে গুণতির সময় আমাদের অনুপস্থিতি না ধরা পড়ে, সেজন্য বিভিন্ন কৌশল নিয়ে কয়েকদিন মহড়া দেওয়া গেল। দীনেশ মজুমদার ও সুশীল দাসগুপ্ত পায়খানার নিকট থাকত গুণতির সময়। তাঁরা দুজনেই পায়খানার দরজায় হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রেখে পায়খানায় যেত। আর আমি জ্বরের ভান করে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকতাম। ক্রমে গুণতি মেলানোর সেপাইরা আমাদের চেহারা না দেখেই আমরা আছি ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।...পালানোর দিন সন্ধ্যার গুণতিতে আমরা তিনজন ওয়ার্ডের বাইরে লুকিয়ে থাকলেও আমাদের অনুপস্থিতি করতে পারে না।"

যাইহোক এরপর এস মার্কা হুক পাঁচিলে লাগিয়ে কাপড়ের মই করে সব বাধাবাধি করে পালান দীনেশবাবুরা। প্রথমে শচীনবাবু পৌছান মেদিনীপুর ষ্টেশনে। তারপর সুশীলবাবু এবং অনেক পরে পৌছান দীনেশবাবু। পায়ে আঘাত লেগেছিল খুব জোর। তিনি সকলকে পালাতে বলেন কারণ তাঁর জন্য যাতে তাঁরা ধরা না পরেন।

কিন্তু একজনও তাঁকে ছেড়ে যেতে প্রস্তুত ছিল না। পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে যেন মৃতের ভান করিয়ে তাঁকে ট্রেনের বাঙ্কে শুইয়ে রাখা হল। এরপর দীনেশবাবু এ অবস্থায় হাওড়া পৌছান। তখনও জেলে কেউ জানে না ওঁরা পালিয়েছেন। পরে এক পাহারাদারের সন্দেহ হয় এবং এলার্ম বাজিয়ে দেওয়া হলে সবাই জানতে পারে আসামী পালিয়েছে।

এরপর নানা অসুবিধার মধ্যে দীনেশবাবু চন্দননগরের বিপ্লবী শ্রীশ ঘোষের আশ্রয়ে চলে যান। এই শ্রীশবাবু তাঁকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে দেন। এদিকে চন্দননগরে পুলিশের দাপট বেড়ে চলল, কারণ চন্দননগর তখন বিপ্লবীদের আত্মগোপনের এক প্রধান স্থান হয়ে ওঠে। এসময় একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। জনৈক আত্মগোপনকারীর গতিবিধি পুলিশ জেনে ফেলে। যাই হোক, এসময় বিপ্লবী মনোরঞ্জন বাবু প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে চন্দননগরে এসে ওঠেন; ডঃ হীরেন চ্যাটার্জী তার চিকিৎসা শুরু করেন। আসলে মনোরঞ্জনবাবুর চিকিৎসার চেয়ে দীনেশবাবুর অসহায় অবস্থাটা জানানোই মূখ্য ব্যাপার ছিল। কিন্তু এরমধ্যে বৃটিশ পুলিশ গন্ধ পেয়ে গেছে।

এরপর যা হবার তাই হয়েছে। ১৯৩৩ সালের ৯ই মার্চ ফরাসী পুলিশ কমিশনার মঁশিয়ে কুই ধরতে গেলেন দীনেশবাবুকে। অনিবার্য ফল সংঘর্ষ। ফলে কুই তো মারা গেলেনই, তবে বিপ্লবীদের মধ্যে বিষ্ণু বলে একটি ছেলে ছিল, বন্দুকের একটি গুলি তার উরু ভেদ করে চলে গেল। এরপর প্রমথ দত্ত এবং মনোরঞ্জন হাজরা দীনেশবাবুকে অমর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি পৌছে দেন। প্রমথ দত্ত রিভলবার নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। মনোরঞ্জন হাজরা দূর থেকে অমরবাবুর বাড়িটা

দেখিয়ে সরে পড়েন। কেননা আইডেনটিফায়েড হওয়া তখন ছিল সাবধানতার একটি অঙ্গ।

দীনেশ মজুমদার জন্মগ্রহণ করেছেন ১৯০৭ সালে ২৪ পরগণার বসিরহাটে। তাঁর বাবার নাম ছিল পূর্ণচন্দ্র মজুমদার। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি বলতেন "এ্যাকশন ইজ লাইফ এণ্ড লাইফ মিন্‌স্ এ্যাকশন।"

বৃটিশ সরকার এসময়ে একটি অর্ডিন্যাস পাশ করে। অর্ডিন্যাসটি দীনেশবাবুকে লক্ষ্য করেই পাশ হয়। জেল থেকে পালাবার পর কোন সশস্ত্র ব্যক্তিকে ধরা হলে তার মৃত্যু দণ্ড হবে। এরপর সেই আইন সত্যি হল। এদিকে তিনি অমরেন্দ্রনাথের বাড়ি থেকে কলকাতার ১৩৬/৩বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে গিয়ে উঠেছিলেন। সেখানে ২২শে মে কলকাতা পুলিশ চিত্রা সিনেমার সামনে সমস্ত পাড়া ঘিরে দীনেশবাবুকে ধরতে যায়। অনেকক্ষণ ধরে পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময় হয়। এরপর বিপ্লবীদের গুলি ফুরিয়ে যায় এবং দীনেশ মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর বিচারের সেই চিরকালীন প্রহসন হল। ১৯৩৪ সালের ৯ই জুন ফাঁসির মালা গলায় পড়ে একজন বীর স্বাধীনতা যোদ্ধার জীবনদীপ চিরকালের মত নির্বাপিত হল। তবে দীনেশ মজুমদারদের মৃত্যু নেই। তাঁরা অমর।

আজ আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, পূর্ণ স্বাধীনতা দেখার স্বপ্ন দীনেশ মজুমদারের মত বিপ্লবীরা দেখেছিলেন তা কি বাস্তবায়িত হয়েছে? উত্তরে বলবো—না। আজ নেতৃত্বহীন ভারতে এই মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীদের শোধ করবার বস্তুতঃ কাউকে চোখে পড়ছেনা। দীনেশ মজুমদারদের মত মানুষদের আবার ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে আসতে

হবে বাকী কাজটুকু সমাধা করতে। আজ দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার ৪৩ বৎসর পরে যুবসমাজকে বিপথে ঠেলে দেবার' জন্য কিছু ব্যক্তি চেষ্টিত, কেননা তা না করতে পারলে ভবিষ্যতে তাদের বংশধরদের জন্য আখের গোছানো সম্ভব নয়। বৈপ্লবিক নামাবলী পড়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আপোষ আজকের রাজনীতির নয়া কৌশল। আসলে কতকগুলো শ্লোগান সর্বস্ব .রাজনীতির আড়ালে পুঁজিবাদকে বিকশিত ও পল্লবিত করবার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম; প্রফুল্ল চাকী ও দীনেশ মজুমদারের মাতৃভূমির উপর। তাই বলি যুব সমাজ যেন দীনেশ মজুমদারের মত স্বার্থত্যাগ করতে শেখে। কারণ তাদের সামনেতো দেশ প্রেমের জ্বলন্ত আদর্শ রয়েছে কেমন করে মাতৃভূমির মুক্তি সাধনায় ফাঁসির দড়ি গলায় দিয়ে বিপ্লবীরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

অগ্নিযুগের বিপ্লবী সুবোধ কুমার রায় ঃ একটি বিস্মৃতপ্রায় ব্যক্তিত্ব

আজকের দিনে অনেক বন্ধু বান্ধবের মুখে শুনি বিপ্লবীদের কটাক্ষ করতে এই বলে, যদি তাদের কেউ জেল খাটতেন, তবে তারাও রাজনৈতিক ভাতা পেতে পারতেন। কোন একজন তো বলেই ফেললেন, "বাবাকে বলেছিলাম, কেন যে তিনি একটু জেল খাটলেন না।" তখন আমাদের মনে হয়, বিপ্লবীরা যখন জেলে গিয়েছিলেন, তাঁরা তখন মরতেই গিয়েছিলেন, কোন আশা বা প্রত্যাশা তাঁদের তখন ছিলনা। একথা প্রসঙ্গে আমরা ঐ সব ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলাম, যদি আপনাদের বাবা ঠাকুরদাকে শহীদ হতে বলতেন তবে আপনারা আরো অনেক কিছু সুবিধা পেতেন।

এখন যাঁর কথা বলব তাঁর নাম সুবোধ কুমার রায়, যিনি আত্মপ্রচারকে ঘৃণা করতেন, এঁর তৈলচিত্র মহাজাতিসদনে শোভা পাচ্ছে। তিনি একাধারে বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিক্ষাবিদ ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি নিজেকে একজন অত্যন্ত সাধারণ মানুষ মনে করতেন। দুঃস্থ নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে জীবনে জীবন যোগ করে চলতেন।

ময়মনসিংহের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রাহামের অত্যাচারে স্বদেশীদের ঘুম চলে গিয়েছে যখন, তখন তাঁরা স্থির করলেন যে ভাবেই হোক গ্রাহামকে সরাতেই হবে। তাই দেখি একদিকে গ্রাহাম হত্যার ষড়যন্ত্র

অপর দিকে সাতরা চরপাড়া স্বদেশী ডাকাতির মত দুটো কেসই সুবোধ কুমারের উপর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

একদিন সুবোধ কুমার ও তাঁর বন্ধু হারান ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নামবার পর পুলিশ তাঁকে ও তাঁর বন্ধুকে আগ্নেয় অস্ত্র সঙ্গে রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। অবশ্য প্রমাণ অভাবে তাঁদের কিছু দিনের জন্য ছেড়েও দেওয়া হয়। সুবোধ কুমারের জীবনের আরেক নাম মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর জীবনের প্রতিটি স্পন্দন সমাজের অবহেলিত দুঃস্থ মানুষের কল্যানের স্বার্থে নিয়োজিত করতে। তিনি বলতেন—সব মানুষের মধ্যে একটি পবিত্র মানুষ বাস করে, তবে তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে জাগিয়ে তুলতে হয়।

সুবোধ কুমার ১৯০৭ সালের শুভ জন্মাষ্টমীতে ময়মনসিংহ জেলার পুঠীজানা গ্রামে এক সচ্ছল তালুকদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পিতা রসিকচন্দ্র রায় এবং মাতা সৌদামিনি দেবীর পাঁচপুত্রের মধ্যে চতুর্থ পুত্র। সুবোধ কুমার ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রবোধ কুমার তৎকালীন ইংরেজ সরকারের ভীতিপ্রদ 'যুগান্তর' দলের সদস্য ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা মন্মথ কুমার রায় ও তৃতীয় ভ্রাতা প্রদ্যুত কুমার রায়ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কনিষ্ঠভ্রাতা প্রবোধ কুমার সালদা ডাকাতি মামলার আসামী হন এবং ময়মনসিংহে সর্বপ্রথমে বিশেষ ট্রাইবুনেলের বিচারে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন।

সুবোধ কুমার মাত্র পনের বছর বয়সেই স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং রাজনৈতিক জীবনে তিনি বিপ্লবী মহানায়ক সুরেন্দ্র

মোহন ঘোষের সহকর্মী ছিলেন। তিনি বিপ্লবী নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী এবং শ্যামানন্দ সেনের সঙ্গেও রাজনৈতিক কাজকর্ম করেন। তিনি ডঃ ত্রিগুণা সেনের সঙ্গে বহরমপুর ক্যাম্পে কাটান। দেউলি বন্দীনিবাসে তিনি প্রায়ত প্রবীন বিপ্লবী এবং মার্কসবাদীনেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং প্রাক্তনমন্ত্রী প্রয়াত ভূপতি মজুমদারের সঙ্গে কাটান। এই সঙ্গে স্মরণ করা যায় যে পূর্বপাকিস্থানের অর্থমন্ত্রী, বাংলাদেশের মুজিব সরকারের আইনমন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধরের সঙ্গেও দেউলি বন্দীনিবাসে রাজবন্দী হিসাবে কাটান। তাঁর বন্দীজীবনের সাথী এবং সর্বক্ষেত্রের পরামর্শদাতা ছিলেন প্রধান বিপ্লবী এবং প্রাক্তন কর্ম সচিব, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের নিয়ামক প্রয়াত হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

সুবোধ কুমার রায়ের রাজনৈতিক বন্দীজীবনের বিবরণ—(ক) ১৯৩১ সালের ৪ঠা নভেম্বর বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে চলার জন্য ময়মনসিংহে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ময়মনসিংহ জেলে ২৩শে নভেম্বর পর্যন্ত আটক রাখা হয়। প্রমাণের অভাবে ২৪শে নভেম্বর তাঁকে অল্পদিনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়।

(খ) ১৯৩২ সালের ৪ঠা জুলাই BCLA ACT এর মাধ্যমে পুনরায় ময়মনসিংহ জেলে কারারুদ্ধ করা হয়। (গ) ১৯৩২ সালের ৯ই আগষ্ট তাঁকে হিজলী জেলে রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে স্থানান্তরিত করা হয়।

(ঘ) ১৯৩৩ সালের ৮ই ডিসেম্বর পুনরায় রাজপুতানায় দেউলি বন্দী নিবাসে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে একটানা ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্দীজীবন কাটাতে

হয়। দেউলি বন্দীনিবাসে অন্যায়ের প্রতিবাদে ২৩ দিন অনশন করেন। পরে কর্তৃপক্ষ বলপ্রয়োগে খাদ্য গ্রহণে বাধ্য করেন।

(ঙ) ১৯৩৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর বহরমপুর ক্যাম্পে রাজবন্দী হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয়।

(চ) ১৯৩৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তিনি নবীননগরে (ত্রিপুরা) অন্তরীণ হন।

(ছ) ১৯৩৮ সালের ১লা জুন নিজবাড়ি পুঠিজানাতে অন্তরীণ থাকতে হয়। অবশেষে ১৯৩৮ সালের ২০শে জুলাই সুবোধ কুমার বিনাসর্তে মুক্তিলাভ করেন।

বন্দীজীবন থেকে মুক্তির পর স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বপর্যন্ত তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কাজকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

১৯৩৯ সনে তিনি এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করেন। পাবনা-জেলার হীরালাল বন্দোপাধ্যায়ের কন্যা জ্যোৎস্না দেবীকে সুবোধ কুমার বিবাহ করেন। সংসারে থেকেও তিনি জাগতিক সুখের প্রতি নিস্পৃহ ছিলেন। জ্যোৎস্নাদেবীও স্বামীর মানসিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। ময়মনসিংহে থাকাকালীন জ্যোৎস্নাদেবী হাসিমুখে স্বামীর বিপ্লবী বন্ধুদের বিপদে আপদে সাহায্য করতেন। চরকা কাটা ও চরকা কাটা শেখানো তার দৈনন্দিন কাজের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। সুবোধ কুমারকে স্বামী হিসাবে পেয়ে জ্যোৎস্নাদেবী গর্ব অনুভব করতেন এবং আজও করেন। স্বামী দানধ্যান করে যখন সর্বস্ব খুইয়ে বসতেন, তখন জ্যোৎস্নাদেবী তার গহনাবিক্রি করে সংসার চালিয়ে স্বামীর আদর্শ অনুযায়ী চলতে সাহায্য করতেন। তারই প্রেরণায় সুবোধ

কুমার যখন গোঘাটের মত অজ পাড়াগাঁয়ে লোকশিক্ষার আদর্শ সামনে রেখে একটি উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাতে সুবোধ কুমার সর্বশান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই দুঃসময়ে জ্যোৎস্নাদেবী আদর্শ স্ত্রীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। সুবোধ কুমারের মৃত্যুর আগে ও পরে আর্থিক কারণে তাঁর যাতে মাথা হেঁট না হয় সেজন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন।

সুবোধ কুমার প্রথম জীবনে আইনব্যবসা আরম্ভ করলেও পরবর্ত্তী কালে শিক্ষকতাকেই জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। প্রধান শিক্ষক হিসাবে তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় এবং পরিশ্রমে নিজগ্রামের নিকট ঝনকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি আরামবাগ মহকুমায় গোঘাট (হুগলীজেলায়) গ্রামে প্রধান শিক্ষক হিসাবে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে (High School) যোগদান করেন এবং পরবর্তীকালে বিদ্যালয়টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্বপদে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে উক্তবিদ্যালয়টির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তাঁর নিখুঁত শিক্ষাদান প্রণালী এবং ছাত্রশিক্ষকের মধুর সম্পর্ক স্থাপনের দৃষ্টান্ত স্থানীয় সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষন করে। তাঁর সামান্য উপার্জন থেকে তিনি গরীব ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে উপকার করতেন। তাঁর বেতন থেকেও তিনি দান করে গেছেন। ১৯৫৪ সালে গোঘাট উচ্চবিদ্যালয় থেকে একজন গরীব কৃষকের পুত্র স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় দ্বাদশ স্থান অধিকার করে। স্থানীয় লোকেরা আদর্শস্থানীয় শিক্ষক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে সুবোধ কুমার রায়কে আজও স্মরণ করেন। তাদের শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে গোঘাট থানার পার্শ্বে অবস্থিত

রয়েছে 'সুবোধ স্মৃতি সদন।' তিনি ১৯শে মে ১৯৫৯ সালে রাত্রি ১১-৫৫ মিনিটে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দীর্ঘদিন উচ্চরক্তচাপের দরুণ ইউরেমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে ৫২ বৎসর বয়সে পরলোকগমণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর চারভ্রাতা, স্ত্রী, দুইপুত্র, অগণিত আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু বান্ধব রেখে গেছেন।

আজকের অনেক নামী দামী রাজনৈতিক নেতারা যে ভাবে সুযোগ সন্ধানের কাজে ব্যাপৃত, তখন সুবোধ কুমারের মত মানুষদের কথা বারে বারে মনে পড়ে।

মৃত্যুঞ্জয়ী বীর বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "দুর্লভ জিনিষের সুখসাধ্য পথকেই বলে ফাঁকির পথ।" একথা বলতেই হবে ভারতের অগ্নিযুগের বিপ্লবী যুবকেরা দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে সুখসাধ্য পথে যাত্রা করাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথের সুরে সুর মিলিয়ে বিপ্লবী যুবকগণ ফাঁকি বাজির স্বরাজ সাধনাকে মেনে নিতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় দেখতে পাই যে তিনি বলছেন "সবচেয়ে সহজ দেবতার কাছে সবচেয়ে কম দেওয়ার দাবী মানুষের প্রতি সবচেয়ে অন্যায় দাবী বড় যখন ডাক দেন তখন বড় দাবীই করেন, তখন মানুষ ধন্য হয়। কেননা মানুষ তখন আপন তুচ্ছতার মাঝখানে চমকে জেগে ওঠে, বুঝতে পারে সে বড়।" বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তকে খুব কম মানুষ বুঝতে চেষ্টা করেছেন। আমরা বলছিলাম বি বি ডি বাগের সেই বিনয় বাদল দীনেশের—দীনেশ সম্পর্কে। দীনেশ স্বাধীনতার পথকে কখনও সুখসাধ্য পথ বলে মনে করেন নি।

দীনেশ গুপ্ত ১৯১১ সালের ১১ই ডিসেম্বর (জেলের রেকর্ডে ৬ই ডিসেম্বর) ঢাকায় এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দীনেশের বাবার নাম ছিল সতীশচন্দ্র গুপ্ত। দীনেশ পড়াশুনা করেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। আমরা সকলেই জানি ঢাকা একসময় বিপ্লবী স্বাধীনতা-কামীদের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। পড়াশুনা চলাকালীন দীনেশ তদানীন্তন বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ হেমচন্দ্র ঘোষ, হরিদাস দত্ত, মেজর সত্য

গুপ্তর সংস্পর্শে আসেন। তাঁরা দীনেশের মধ্যে একজন দক্ষ সংগঠককে দেখতে পেলেন। দীনেশ অচিরেই ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবী সংগঠন তৈরী করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এইভাবে আমরা দেখলাম, দীনেশ ছাত্রযুবকদের নিয়ে নানারকম গোপন অনুষ্ঠান করা শুরু করলেন এবং এভাবেই বি ভি (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স) দলকে রীতিমত শক্তিশালী করে তুলতে সক্ষম হলেন। ওদিকে "বেনু" গ্রুপের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ বেশ ভালভাবে হতে আরম্ভ করে। বিনয় বোস ছিলেন "বেনু" গ্রুপের ! অবশ্য পরে বি ভির সঙ্গে তা মিশে যায়। এভাবে দীনেশের সংগঠন ক্ষমতায় সন্তুষ্ঠ হয়ে নেতৃবৃন্দ তাঁকে মেদিনীপুরে পাঠালেন। মেদিনীপুরে তিনি যেভাবে কঠোর পরিশ্রম করে সংগঠনের কাজ করেছেন তাতে শুধু বি ভি নেতারাই লাভবান হয়েছেন তা নয়, লাভবান হয়েছে সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষ। ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর দুপুর বেলায় সাহেবী পোষাকে তিনজন যুবক রাইটার্স বিল্ডিংস এর সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন। ইউরোপীয় সার্জেন্ট জিজ্ঞাসা করলেন তারা কোথায় যাবেন? তখন তাঁরা একটা কাগজ দেখিয়ে বলে উঠলেন, ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্সের কাছে। সার্জেন্ট হাতের কাগজটা যে কি তা ভালকরে পরীক্ষা না করেই তাদের ছেড়ে দিলেন। এরপর একেবারে কারা বিভাগের ইন্সপেক্টার জেনারেল মিঃ সিম্পসনের ঘরের সামনে গিয়ে স্লিপ দেওয়া বা কারোকে জিজ্ঞাসা না করে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে চালিয়ে দিলেন গুলি। সিম্পসন ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে এবং কয়েকজন আহত হয়ে পালাতে লাগলেন। এখন যে কথা বলছিলাম, এই তিনজন আর কেউ নয়, এরা অলিন্দ যুদ্ধের বিপ্লবীত্রয় বিনয় বোস, বাদল (সুধীর গুপ্ত) এবং দীনেশ গুপ্ত।

এখানে এঁদের একজনের আলোচনা করলে তিনজনই এসে পড়ে। কারণ সংগ্রামের ক্ষেত্রে এঁরা একে অন্যের পরিপূরক।

যাই হোক এই তিন বিপ্লবী রাইটার্সের করি ডোরে আসতেই আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। চলতে লাগল কিছুক্ষণ ধরে গুলি বিনিময়। ইতিমধ্যে টেগার্ড তার বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসে এঁদের উপর আক্রমণ করলেন। বাদল নিজেকে পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে পটাসিয়াম সায়োনাইড খেয়েনিলেন। বিনয় ও দীনেশ নিজেরা নিজেদের গুলি করলেন। বিনয় দুদিন পরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেলেন। কিন্তু দীনেশ অপারেশনের পর বেঁচে উঠলেন। এরপর ইংরেজ শাসকরা দীনেশের উপর যে পাশবিক অত্যাচার করেছে তাতে ইংরেজকে সুসভ্য জাতি হিসাবে চিনতে ভুল হয়। আমরা জানি যুদ্ধে আহত শত্রু সৈন্যকে ষ্ট্রেচার করে আন্তর্জাতিক রেডক্রশ অথবা নিজেদের হাসপাতালে রাখার নিয়ম আছে। ভাল হয়ে গেলে তাকে যুদ্ধবাদী হিসাবে রাখা যেতে পারে। কিন্তু ইংরেজ শাসকরা এসব নিয়মের ধার ধারেন না। এসময়ে ভারত সরকারের "ইণ্ডিয়ান মাষ্টার্স" পুস্তকের ১২২ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে "ক্রুটালি টরচারড্ ইন জেল" যে ব্যক্তি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছিল ঘটনা চক্রে তাকে ইংরেজরা বাঁচিয়ে তুলল। কিন্তু এরপর তারা দীনেশের উপর ক্রুটালি টরচার করে কোন যুক্তিতে, বিচার না করে সুসভ্য ইংরেজের টরচার চালাতে বিবেকে একটুও লাগেনা। অথচ ইংরেজ জেলের মধ্যে তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার করেও কোন কথা তাঁর মুখ থেকে আদায় করতে পারেনি। এরপর ইংরেজ শাসকবর্গ বিচারে প্রহসন করলেন। আলিপুরের ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ গার্লিককে বিশেষ ট্রাইবুনেলের সভাপতি

করে ট্রাইবুনেল বসল। লোক দেখানো বিচারে দীনেশের ফাঁসির হুকুম হল। সারাদেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল দীনেশের বিচারের বাণী শুনে, কারণ তিনজন গিয়েছিলেন সিম্পসনকে মারতে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কার গুলিতে সিম্পসন মারা গিয়েছিলেন, তা কেমন করে জানা গেল। বাদল এবং বিনয় আগেই মারা গেছেন, এখন এই দুজনের মধ্যে একজনের গুলিতে যে সিম্পসন মারা যান নি তা কে বলবে? তাই দীনেশের পক্ষে একটা বেনিফিট অব ডাউট থেকেই গিয়েছিল। ঠিক এইরকমই একটা পরিস্থিতিতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর (বাস্তুহারা নেতা) প্রাণদণ্ড নাকচ হয়ে যায়। আমরা জানি সুসভ্য ইংরেজ বলত,—শত শত দোষী ব্যক্তি যদি ছাড়া পায় তো পাক কিন্তু একটিও নির্দোষ ব্যক্তির যেন সাজা না হয়। কিন্তু দীনেশের বেলায় সে কথা খাটে নি।

এই ঘটনায় মানুষ এত ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে দীনেশের ফাঁসির পর দিন-কুঁড়ি ও পার হয়নি, ঐ জজসাহেব মিঃ গার্লিককে যুগান্তর দলের সাত কড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের দলের কানাই ভট্টাচার্য নামে এক যুবক গুলি করে হত্যা করে। তারপর সে পটাসিয়াম সায়োনাইড খেয়ে ঘটনাস্তলেই প্রাণ বিসর্জন দেয়।

এদিকে দীনেশ, যার ডাক নাম ছিল "নসু" সবাই আসন্ন শোকে বেদনায় ভারাক্রান্ত। কিন্তু 'নসু' বা দীনেশ একেবারেই ভয় পায় নি। কেন না বিপ্লবী সত্বা ছাড়াও তাঁরমধ্যে ছিল একটি শিল্পী সত্বা। দীনেশের ছিল এক রুচিকর শিল্পী মন। তাঁর লেখা "মেঘ ও রৌদ্র" নামক একটি ছোট গল্প যখন প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক সাংবাদিক জগতের দিকপাল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে এসে পড়ল, তখন

তিনি ভাবতেই পারেন নি যে এই লেখা এসেছে ফাঁসির কুটুরী থেকে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রহরগণনারত একটি তাজা প্রাণের নিকট থেকে। তিনি ভাবলেন ফাঁসির আসামীর কলম থেকে কেমন করে বেরিয়ে এল এই গল্প। ফাঁসির কথা শুনলেই সাধারণত মানুষের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। লেখা তো শিল্পী মনের কারুকার্য—তার ভাষা আছে, ব্যাকরণ আছে, প্রকাশ ভঙ্গী আছে এবং রসের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হওয়ার একটা প্রয়োজনীয় কক্ষপথ আছে। রামানন্দবাবু গল্পটা পড়ে সোজা প্রেসে পাঠিয়ে দিলেন। সাদামাটা গল্প। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত বক্তব্য ছিল জ্বালাময়ী, সেদিন মানুষ চমকে উঠেছিল। স্বদেশ প্রেমিক হিসাবে তো বটেই। তাছাড়া এমন একজন প্রতিভাবান শিল্পীর জীবন দীপ নির্বাপিত হয়ে যাবে অচিরেই তাঁর ফাঁসির সঙ্গে সঙ্গেই। একটা কথা আমাদের মনে হয় 'মেঘ ও রৌদ্র' যে লিখতে পারে বা রামানন্দ বাবুর মত বিদগ্ধ সাংবাদিককে যে মুগ্ধ করতে পারে সে তো যে সে মানুষ নয়, তা বলাই বাহুল্য। তাই ফাঁসির আগের মুহূর্ত্তে তাঁর প্রতিভার সাক্ষর রেখে গেলেন "মেঘ ও রৌদ্র" গল্পটির মধ্যে দিয়ে।

ইংরাজী লিবার্টি কাগজে বাংলা হরফে ছাপা তাঁর চিঠিগুলোর মধ্যে যে ভাব ফুটে উঠেছিল, তাতেই তাঁর পরিপূর্ণ মানসিকতার প্রমাণ মেলে। একটি চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধৃত করে বলেছিলেন—

"ওগো এত মালা নয়,
এযে তোমার তরবারি
জ্বলে ওঠে আগুন যেন
বজ্রসম ভারী"

আর একটি চিঠিতে ফাঁসির আগে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে লিখেছিলেন—

'কে সে জানিনা কে।
চিনি নাই তারে
শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীতি
ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সংকট আবর্ত মাঝে
দিয়েছে সে বিশ্ববিসর্জন
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি
মৃত্যুর গর্জন

শুনেছে সে সঙ্গীতের মত। সত্যি বলতে কি দীনেশবাবু মৃত্যুর গর্জনকে সঙ্গীতের মতই শুনেছিলেন। তাই দেখা গেল ফাঁসির আগে তিনি তাঁর বৌদি ও আত্মীয় স্বজনদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন—"বিদায় দিতে হয়তো তোমাদের—তোমাদের বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে, কিন্তু কি করিব, বিদায় যে লইতেই হইবে।" ১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই ভোরে দীনেশের ফাঁসি হয়। সেদিন কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকায় হেডলাইনে লেখা হয়েছিল "ডন্ট লেশ দীনেশ ডাইজ এ্যাট ডন।"

এভাবেই আমরা দেখলাম বীর শহীদ দীনেশ গুপ্ত ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন।

বাংলার মহিলা বিপ্লবী বীণা দাস (ভৌমিক)

বিপ্লবের আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন বহু বাঙ্গালী সন্তান। বিপ্লবীরা চেয়েছিলেন ইংরেজদের হাত থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে। একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় বিপ্লবীরা যা আশা করেছিলেন তা পূর্ণ হয়নি। তবে তাদের নিঃস্বার্থ ত্যাগ সেদিন হাজার হাজার যুবক যুবতীদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিপ্লবী ননীবালা দেবী যে পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, সে পথের নিশানা ধরে বাঙ্গালী মেয়েরা স্বাধীনতা যজ্ঞে একের পর এক আত্মাহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

এখন যার কথা বলতে চাই, তাঁর নাম অনেকেই জানেন, তবে তিনি বহু আলোচিত বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে পড়েন না। এই মহীয়সী নারীর নাম বীণা দাস। বীণা দাস ১৯১১ সালের ২৪শে আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বেণী মাধব দাস কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন এবং সেই সঙ্গে খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ হিসাবে সম্মানিত ব্যক্তিও ছিলেন। বীণা দাস ছিলেন যোগ্য পিতার যোগ্যা কন্যা। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে সাচ্ছন্দ্যময় পারিবারিক স্নেহচ্ছায়ায়, পিতামাতার আদর্শ, পিতার স্বদেশ প্রেম ও অগ্রজা কল্যানী দাসের (ভট্টাচার্য) প্রভাবে বেশ কেটে যাচ্ছিল তাঁর জীবন। এই সঙ্গে বলা আবশ্যক তিনি কৈশোর থেকে চরকা কাটতে শিখেছিলেন। তিনি বিদেশী কাপড় বর্জন এবং সেই সঙ্গে খদ্দরের কাপড় পড়া ছিল তার স্বভাব।

এভাবে যখন তাঁর দিন চলছিল তখন তিনি ছাত্রী সংঘের সদস্যা হলেন এবং তখনই তিনি পরিচিত হলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে।

এ সময় থেকেই তাঁর ছাত্রী জীবনের সঙ্গে সঙ্গে দেশ প্রেমিক জীবনেরও শুরু হল। কলেজ জীবনের প্রথম দিকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সেচ্ছাসেবিকা হিসাবে যোগ দিয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি সরকারী বেথুন কলেজের কৃতী ছাত্রী হিসাবে ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বয়কট করেন এবং প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ছাত্রী জীবনেই দেখা যায় বীণা দাস বিপ্লবী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনের সময় তৎকালীন গভর্ণর ও চ্যান্সেলর স্ট্যানলি জ্যাকসন এসেছেন ডিগ্রীদেবার জন্য। বিপ্লবী বীণা দাস গভর্ণরকে বৃটিশ সরকারের অত্যাচারের প্রতীক হিসাবে চিন্তা করেছিলেন। তিনি ডিগ্রী নিতে এসে তার শরীরের মধ্যে লুকিয়ে এনেছিলেন পিস্তল, হঠাৎ স্ট্যানলিকে লক্ষ্য করে গুলি চালালেন বীণা দাস। অল্পের জন্য স্ট্যানলির জীবন রক্ষা পেল। স্ট্যানলিকে অপসারনের চেষ্টা ব্যর্থ হল। একথা বলতেই হবে, বীণা দাস স্ট্যানলি হত্যার চেষ্টা করেছিলেন ব্যক্তি হিসাবে নয়, একজন অত্যাচারী ইংরেজ হিসাবেই তাকে সরানো ছিল বীণা দাসের পবিত্র কর্তব্য। যাই হোক বীণা দাস ইংরাজীতে অনার্সসহ বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

কনভোকেশনে দুঃসাহসিক কাজের জন্য তার নয় বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। গান্ধীজীর রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলনের ফলে ১৯৩৯ সালে তিনি কারগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। এসময় থেকে বিপ্লবী

যুগান্তর দলের নির্দ্দেশে কংগ্রেসের মহিলা সঙ্ঘের কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪২ সালে কলকাতা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা হিসাবে তাঁকে বৃটিশ সরকার তিনবছরের জন্য বন্দী করে রাখে।

এরপর থেকে বিপ্লবী বীণা দাস দেশের সেবায় বিভিন্ন ভাবে নিজেকে যুক্ত রাখেন। ১৯৪৬ সালে কংগ্রেস কর্মী হিসাবে নোয়াখালির দাঙ্গার পর সেখানে যান ও বিভিন্ন ক্যাম্পে সংগঠন ও স্কুল চালান। ১৯৪৬—৫১ সাল পর্যন্ত যুক্তবঙ্গের শেষ বিধানসভার সদস্য হন।

এই বীণা দাসকে আমরা ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের ভূমিকায়ও দেখতে পাই। অমৃত বাজার কর্মচারী ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন প্রবল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ১৯৪৮ সালে ঐতিহাসিক ধর্মঘট পরি-চালনা করেন। ১৯৪৭ সালে যুগান্তর পার্টির সদস্য স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ফরোয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদক সতীশ ভৌমিকের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৪৭ সালে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্থানে শেখ মুজিবর রহমনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষনার দিনটিতে তিনি কয়েকজন সঙ্গিনী নিয়ে যশোহর সীমান্তে গিয়ে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে অনেকের মত সীমান্ত মুক্তি ফৌজের সাহায্য কারিনী ছিলেন। ১৯৭৫ সালে ইমার্জেন্সির বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হন। মরীচঝাঁপিতে শরণার্থীদের উপর পুলিশের গুলিচালনার বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার হন। অন্যায়ের সঙ্গে তিনি কখনো আপোষ করেন নি। একথা স্মরণ রাখা দরকার যে বীণা দাসের পিতা বেণীমাধব দাস নেতাজী সুভাষচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন। বেনীমাধববাবুকেও দেশ প্রেমিক হবার জন্য অনেক দুঃখ স্বীকার করতে হয়েছে।

আজ যখন দেখি চরম আদর্শ হীনতা, সামান্য সুযোগ সুবিধার

জন্য মানুষ কত নীচে নেমে যায়, সেখানে দাঁড়িয়ে বীণা দাসের জীবন আগামী প্রজন্মকে পথের সন্ধান দেবে বলে আশা করা যায়। আমাদের সমাজে যে ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা যাচ্ছে, তা থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের স্মরণ করা এবং তাঁদের নিকট থেকে পথ নির্দেশ নেওয়া।

বিপ্লবী বীণা দাসের মধ্যে দেখতে পাই একাধারে বিপ্লবী চেতনা, অন্যদিকে তিনি ছিলেন সুলেখিকা। তাঁর আত্মজীবনী 'শৃঙ্খল ঝঙ্কার' ও 'পিতৃধন' গ্রন্থ দুটি তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার সাক্ষর বহন করছে। তিনি অনেক কবিতাও লিখেছিলেন যদিও অনেকগুলি প্রকাশিত হয়নি। দীর্ঘকাল তিনি স্কুলশিক্ষিকার কাজ করেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর একাকী নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ে নির্জন বাসের সংকল্পে হৃষীকেশে কাটাবার বাসনা নিয়ে যান, কিন্তু সেখানে তিনি বেশিদিন থাকতে পারেন নি। মৃত্যুর করাল গ্রাস তাঁকে অল্পদিনের মধ্যেই ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। নির্বান্ধব অবস্থায় ১৯৪৭ সালের ২৬শে ডিসেম্বর বিপ্লবী বীণা দাস পরলোকগমন করেন।

আমরা তাঁর অকৃতজ্ঞ দেশবাসী। এতলোকের মৃত্যুদিন বা জন্মদিন পালিত হয়, অথচ এই বীরাঙ্গণা বিপ্লবী বীণা দাসের কথা বছরে একবার স্মরণ করতে ভুলে যাই। অবশ্য এটা স্বাভাবিক, কারণ যে জাতি তাদের অতীতের গৌরবকে স্বীকার করতে চায় না তারা বিপ্লবীদের স্মরণ করবে আশা করা যায় না।

তবে একথাও সত্য, বিপ্লবীরা যে মহান ত্যাগের মাধ্যমে এদেশকে স্বাধীন করে গেছেন, আমাদের কাজ তাকে রক্ষা করে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

ভারতে প্রথম বিপ্লবী মহিলা শহীদ অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

এদেশের মেয়েরা দেশের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারবে কিনা তা এক সময় বিপ্লবীদের মধ্যে সংশয় ছিল। কিন্তু অচিরেই তাদের সে সংশয় কাটতে শুরু করে। অতীতে বিপ্লবী ননীবালা দেবীকে দেখার পর আমাদের বিপ্লবীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে এ দেশের মা বোনেরা মহামায়ার অংশ। শুধু যুগের অপেক্ষায় তাঁরা রয়েছেন। ষোল বছরের বিধবা ননীবালা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এবং প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় ভারতে নুতন গড়ে ওঠা বিপ্লবী যুগান্তর দলের কর্মদ্যোগের মধ্যে যে ভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তা বিস্ময়কর। বাংলায় তিনিই একমাত্র মহিলা ষ্টেট প্রিজনার হন।

যাই হোক, বিপ্লবী মহিলাদের বিপ্লববাদে দীক্ষা নিতে আমরা পরবর্তীকালে অনেককেই দেখেছি। এখন যাঁর কথা শোনাব ভেবেছি, তিনি হলেন ভারতের প্রথম মহিলা শহীদ প্রীতিলতা। তাঁকে অনেকে অগ্নিকন্যা সম্বোধন করেন। প্রীতিলতা ১৯১১ সালের ৫ই মে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার। ছাত্রী জীবনে ঢাকার বৈপ্লবিক সংগঠন দীপালি সঙ্ঘ ও কলকাতার ছাত্রী সঙ্ঘের উৎসাহী কর্মী ছিলেন। প্রীতিলতা ছাত্রী হিসাবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ঢাকা বোর্ডের আই. এ. পরীক্ষায় মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এ পরীক্ষায়

ডিষ্টিংশন সহ উত্তীর্ণ হন। পরে চট্টগ্রামের নন্দন কানন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পদে নিযুক্ত হন। সে সময় থেকে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের সঙ্গে তার যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং সংসারের অল্প আয় থেকে অর্থ দিয়ে তিনি বিপ্লবীদের সাহায্যে ব্যয় করতেন।

একথা মনে রাখা ভালো যে ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমনের পর প্রীতিলতা প্রত্যক্ষভাবে বৈপ্লবিক কাজের ভার গ্রহণ করেন। এ সময়ে বিপ্লবী প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে জেলে যোগাযোগ রাখবার দায়ীত্ব তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি যুববিদ্রোহের নেতা মাষ্টারদার একজন অত্যন্ত বিশ্বাসী কর্মী হয়ে ওঠেন। দলনেতা মাষ্টারদা (সূর্য্য সেন) যখন ধলঘাটে আত্মগোপন করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ভার পেয়েছিলেন। আমরা অনেকেই জানি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে মিলিটারীর সঙ্গে সংঘর্ষে সরকার পক্ষের ক্যাপ্টেন ক্যামেরুণ এবং বিপ্লবী দলের নির্মল সেনের মৃত্যু হয়। সূর্য্য সেন ও প্রীতিলতা জঙ্গলের ভিতর আত্মগোপন করে গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হন। এরপর ইংরেজ সরকার তাঁদের গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন।

এদিকে বিপ্লবীরা পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। এটিই বর্তমানে তাঁদের অসমাপ্ত কাজ। এখন এ আক্রমণের নেতৃত্বের ভূমিকায় কে থাকবেন? সেখানেও প্রীতিলতা মাষ্টারদার নির্দ্দেশে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। মাষ্টারদা নিজ হাতে প্রীতিলতাকে সৈনিকের বেশে সুসজ্জিত করে দিলেন এবং তিনি যেন ইংরেজ পশুদের হাতে নিজেকে ধরা না দেন সেজন্য নির্দ্দেশ দিলেন। যাহোক প্রীতিলতা একদল

যুবক নিয়ে ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করলেন এবং ইংরেজদের একজনকে নিহত করলেন এবং নিজেরাও কয়েকজন আহত হলেন। সেই সঙ্গে নিজে অক্ষত দেহে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপরের ঘটনা অনেকেই জানেন। তিনি ইংরেজের হাতে ধরা পড়বার আগে দেশবাসীদের উদ্দেশ্যে আত্মদানের আহ্বান রাখলেন। তিনি মাষ্টারদার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে নিজের জীবন থাকতে তিনি আত্মসমর্পণ করবেন না। সে কথার সম্মান রেখেই নিজের পকেটে রাখা পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। এভাবে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই প্রীতিলতা শহীদ হলেন।

আমাদের দায়ীত্ব হচ্ছে প্রীতিলতার আত্মত্যাগের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া। বর্তমানে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে যে কণামাত্র স্বাধীনতা ভোগ করছি তার পিছনেও রয়েছে প্রীতিলতার মত অগ্নিকন্যার আত্মত্যাগ—সে কথা যেন যথাযোগ্য মর্য্যাদার সঙ্গে স্মরণ করতে আমরা ভুলে না যাই।

পরিশিষ্ট—১

বিপ্লবী তারকেশ্বর দস্তিদার

বিপ্লবীদের জীবন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অনেক সময় তাঁদের জন্ম তারিখ নিয়ে নানারকম অস্বস্তিতে পড়তে হয়। তবে আমাদের কাছে কোন বিপ্লবীর জন্ম তারিখ না পাওয়া গেলেও দুঃখের কারণ হিসাবে দেখা দেয় নি, কারণ বিপ্লবীরা দেশমাতৃকার সেবায় বলিদান প্রদত্ত। তাঁদের কেউ জীবনচরিত রচনা করবেন এ পরিকল্পনা নিয়ে তাঁরা দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন নি। এমন অনেক বিপ্লবীকে দেখা যায় যে তাঁরা নিজেদের জন্মের তারিখটি কোথাও লিখে যাননি। তাই তাঁদের আত্মবলিদানের দিনটিকেই আমাদের স্মরণ করতে হয়। এমনই একজন বিপ্লবী সম্পর্কে লিখছি, যাঁর নাম তারকেশ্বর দস্তিদার।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে যারা অবহিত আছেন তাঁরা সকলেই জানেন যে, এই আন্দোলনের অধিকাংশ কর্মীরাই ছিলেন দেশের মধ্যবিত্ত হিন্দুঘরের সন্তান। তারকেশ্বরও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর কাজকর্মের মধ্যে কিন্তু কোন উগ্র সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন পাওয়া যায় না। ব্যক্তি সন্ত্রাসের রাজনীতি শেষ বিচারে কতটা সার্থক হয়েছিল, তা ইতিহাসের বিচার্য বিষয়। কিন্তু ইংরেজ সরকার এই আন্দোলনকে অন্ততঃ প্রথম অবস্থায় শুধু দমন পীড়ননীতির সাহায্যেই একে সম্পূর্ণ রূপে স্তব্ধ করে দেবেন বলে মনে করেছিলেন। তাই

দেখি চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহ কিছু দিনের জন্য হলেও ইংরেজ সরকারের ভীত নড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। আর এই যুব বিদ্রোহের হোমানলে জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে এগিয়ে এসে ছিলেন বিপ্লবী তারকেশ্বর। মাষ্টারদা বা সূর্য্য সেনের আহ্বান তাকে পাগল করে তুলেছিল। তাই যৌবনের স্বাদ আহ্লাদ সব ত্যাগ করে মাষ্টারদার কাছে তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

চট্টগ্রামের সারোয়াতলী গ্রামে তারকেশ্বর দস্তিদার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম চন্দ্রমোহন দস্তিদার। ছাত্রাবস্থায় তারকেশ্বর মাষ্টারদার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরিকল্পনাকারীদের অন্যতম হয়ে ওঠেন। সূর্য্য সেন তথা মাষ্টারদা তখন ইংরেজের হাতে ধরা পড়েন, তারকেশ্বর নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর গুরু মাষ্টারদার আরব্ধ কাজ সমাপনের দায়ীত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির নেতৃত্ব নিয়ে আণ্ডার গ্রাউণ্ড থেকে বিপ্লব পরিচালনা করেন।

অবশেষে চট্টগ্রামের গহিড়ায় পূর্ণ তালুকদারের বাড়িতে ১৯৩৩ সালের ১৯শে সে তারিখে পুলিশের সঙ্গে তাঁর এবং সঙ্গীদের প্রবল সংঘর্ষ হয় এবং তাঁকে গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়। চট্টগ্রামে মাষ্টারদার বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে সর্বপ্রথম বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ইউনিফর্ম পড়ে বিপ্লবীরা সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে তারকেশ্বর এবং অন্যান্যরা যে অসামান্য বীরত্ব দেখিয়েছিলেন তা কোন ভারতবাসীর ভোলা উচিত নয়।

যাই হোক ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী মাষ্টারদার সঙ্গে একই দিনে চট্টগ্রাম জেলে তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হয়।

আজ স্বাধীনতার ৪৩ বছর পরেও তারকেশ্বর দস্তিদারের পরিচয় সাধারণ মানুষকে দিতে হয়। এর চেয়ে লজ্জার কিছু নেই।

তারকেশ্বরের স্বল্প পরিসরের জীবন ছিল ঘটনা বহুল। তিনি ধরা পড়ার পরেও কোন স্বীকারোক্তি বৃটিশ সরকারকে দেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মাতৃভূমি একদিন মুক্ত হবে ইংরেজ দস্যুদের কবল থাকে।

আমরা গর্ব করতে পারি তারকেশ্বর আমাদের বাঙ্গালী ঘরের সন্তান, বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের আলোর দিশারী। তাঁর জীবন আলোচনা একটি পবিত্র কাজ।

আজ রাজনীতিতে যে অবক্ষয় শুরু হয়েছে, তাকে বন্ধ করতে হলে তারকেশ্বরের মত আত্মত্যাগ উদ্বুদ্ধ দেশ প্রেমিক প্রয়োজন, অন্যথায় জাতির ধ্বংস অনিবার্য।

পরিশিষ্ট—২

বিপ্লবী নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

নীরেন্দ্রনাথের নাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমরা সংগ্রাম পরিচালকের নাম বেশি করে মনে রাখি। কিন্তু সংগ্রাম পরিচালক যদি তার সহকর্মীদের তেমন ভাবে সহযোগিতা না পান তবে তার পক্ষে সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব হয়না। তাই আমরা যে কোন মুক্তি সংগ্রামে যিনি নেতৃত্ব দেন তার কথা ভাবার সময় তাঁর সহযোদ্ধাদের কথাও তেমনি করেই ভাববার চেষ্টা করবো।

নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অবিভক্ত বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার খেয়ারডাঙ্গা গ্রামে ১৮৯২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ললিত মোহন দাশগুপ্ত। ১৯১৩ সালে ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি অভিযুক্ত হন এবং তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। এরপর ১৯১৫ সালে জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি গোয়েন্দা নীরদ হালদার কে গুলি করে হত্যা করেন। অতি অল্প বয়সে রাজনৈতিক কাজে যুক্ত হওয়া তার প্রথাগত শিক্ষা লাভ বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি।

অতঃপর বাঘাযতীনের সংস্পর্শে আসেন তিনি এবং তাঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। উড়িষ্যার উপকূলে জার্মাণ জাহাজ ম্যাভেরিক থেকে বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহের কাজে এবং বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বুড়িবালামের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে আহত হয়ে ১৯১৫

সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এরপরের ঘটনা সকলেরই জানা। ৩রা ডিসেম্বর নীরেন্দ্রনাথকে বালেশ্বর জেলে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। হাসতে হাসতে বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী নীরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে যান। তাই আমরা যখন বাঘা যতীনের নাম স্মরণ করবো তখন সেই সঙ্গে স্মরণ করবো নীরেন্দ্রনাথকে চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরীকে এবং মনোরঞ্জন সেনগুপ্তকে আর জ্যোতিষ পাল কে। জ্যোতিষ পালের অবশ্য চোদ্দ বছরের জেল হয়। তিনি পুলিশের অত্যাচারে উন্মাদ হয়ে গিয়ে ১৯২৪ সালে কারাগারেই মারা যান।

পরিশিষ্ট—৩

স্বাধীনতা সংগ্রামী লিয়াকৎ হোসেন, মৌলভী

আজ স্বাধীনতার তেতাল্লিশ বৎসর পর যখন দেখি সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আমরা আচ্ছন্ন, তখন খুব বেশি করে মনে পড়ে লিয়াকৎ হোসেন, মৌলভীকে। যদিও তার জন্ম মৃত্যু সম্পর্কে কোন কিছু আমরা হদিশ করতে পারিনি তবুও তার সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে যতটা জেনেছি তাতে গর্ব অনুভব করছি। অনেককেই বলতে শুনি 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি সাম্প্রদায়িক এবং এটা হিন্দু মুসলমানের মিলনের পথে বাধা হয়ে রয়েছে। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এই 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে যাঁরা ভারতে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি ও সমন্বয় সাধনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, লিয়াকৎ হোসেন তাদের মধ্যে অন্যতম। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি এমন একজন নেতা যিনি স্বদেশী যুগে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে যুবকদের নিয়ে শোভাযাত্রা করতেন।

এই বীর বিপ্লবী শোভাযাত্রা করার আগে সবাইকে সাবধান করে বলতেন 'যাদের ভয় আছে তারা সরে পড়ো। এরপর যে বা যারা ভাগবে সে বা তারা মানুষ নয়, কুকুর, বেড়াল।' তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন। আর কারাবরণটা তার কাছে জলভাত যখন সরকার আইন করে সভাসমিতি বন্ধ করতেন তিনি বারবার সে আইন ভঙ্গ করে কারারুদ্ধ হয়েছেন, এভাবেই সাধারণ লোকের মন থেকে পুলিশের ভয় বিদূরিত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

তিনি সবসময় নিজে দণ্ডভোগ করে অন্যকে ইংরেজ পোষিত পুলিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার ডাক দিতেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য লিয়াকতের মত মানুষকে সেভাবে পরিচয় করানোর চেষ্টা হয়নি এবং তা যদি হত তবে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতের মত দেশকে বিভক্ত হতে হত না। আমরা খুব কম মানুষই লিয়াকৎদের মত নেতাদের সম্পর্কে গবেষণা করবার প্রয়াস পাই। লিয়াকৎ এর জীবনটা ছিল অদ্ভুত ধরণের অসাম্প্রদায়িক।

এখন দিন এসেছে লিয়াকৎ হোসেনের মত মানুষকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে এবং তাঁর জন্ম মৃত্যুর তারিখ খুঁজে বের করতে হবে। একজন মানুষ তার কাজের নিরিখেই বেঁচে থাকে। তাই লিয়াকৎ কত বছর বেঁচে ছিলেন। তা নিয়ে আমাদের খুব একটা আগ্রহ নেই। কিন্তু আমরা ভাববো সেই লিয়াকৎকে যিনি ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি ও সমন্বয় সাধনের নেতা। এমন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী আজকের দিনে বড়ই প্রয়োজন। যেদিন ভারতে দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হবে সে দিন লিয়াকৎ হোসেনের মত হাজারে হাজারে বিপ্লবী প্রয়োজন হবে।

হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি ও সমন্বয় সাধন করবার জন্য আমাদের লিয়াকৎ হোসেনের মত বিপ্লবী প্রয়োজন। ভবিষ্যতে লিয়াকৎ হোসেনের সম্পর্কে আরো গবেষণা হবে এবং সেটাই হবে তাঁর বড় পুরস্কার।